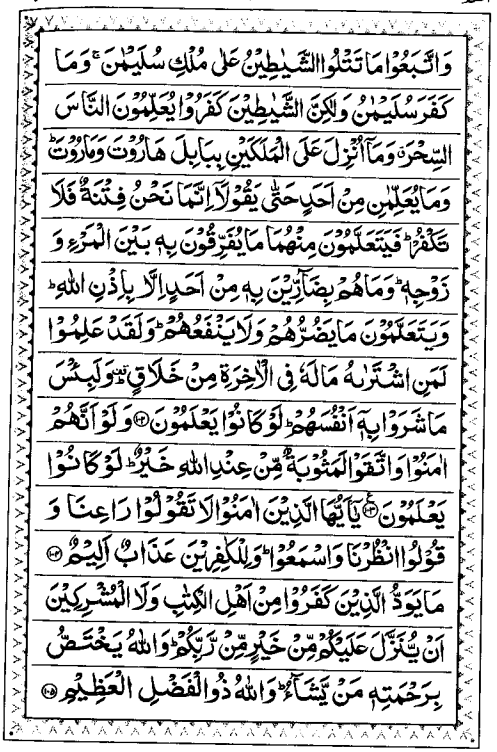

وَاتَّبَعُوْا مَا تَتْلُوا الشَّيٰطِيْنُ عَلٰى مُلْكِ سُلَيْمٰنَ ۚ وَمَا
كَفَرَ سُلَيْمٰنُ وَلٰكِنَّ الشَّيٰطِيْنَ كَفَرُوْا يُعَلِّمُوْنَ النَّاسَ
السِّحْرَ ۗ وَمَآ اُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوْتَ وَمَارُوْتَ ۗ
وَمَا يُعَلِّمٰنِ مِنْ اَحَدٍ حَتّٰى يَقُوْلَآ اِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا
تَكْفُرْ ۗ فَيَتَعَلَّمُوْنَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُوْنَ بِهٖ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ
زَوْجِهٖ ۗ وَمَا هُمْ بِضَآرِّيْنَ بِهٖ مِنْ اَحَدٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۗ
وَيَتَعَلَّمُوْنَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۗ وَلَقَدْ عَلِمُوْا
لَمَنِ اشْتَرٰىهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۗ وَلَبِئْسَ
مَا شَرَوْا بِهٖٓ اَنْفُسَهُمْ ۗ لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ ۝ وَلَوْ اَنَّهُمْ
اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَمَثُوْبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ خَيْرٌ ۗ لَوْ كَانُوْا
يَعْلَمُوْنَ ۝ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقُوْلُوْا رَاعِنَا وَ
قُوْلُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوْا ۗ وَلِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝
مَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ وَلَا الْمُشْرِكِيْنَ
اَنْ يُّنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ خَيْرٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ ۗ وَاللّٰهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝

(১০২) তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সুলায়মানের রাজত্বকালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সুলায়মান কুফর করেনি; শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোন অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আত্মবিক্রয় করেছে, তা খুবই মন্দ—যদি তারা জানত! (১০৩) যদি তারা ঈমান আনত এবং খোদাভীরু হত, তবে আল্লাহ্‌র কাছ থেকে উত্তম প্রতিদান পেত। যদি তারা জানত! (১০৪) হে মুমিনগণ, তোমরা 'রায়িনা' বলো না— 'উনযুরনা' বল এবং শুনতে থাক। আর কাফেরদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক শাস্তি।(১০৫) আহলে-কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কাফির, তাদের মনঃপুত নয় যে, তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি কোন কল্যাণ অবতীর্ণ হোক। আল্লাহ্‌ যাকে ইচ্ছা বিশেষভাবে স্বীয় অনুগ্রহ দান করেন। আল্লাহ্‌ মহান অনুগ্রহদাতা।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

উল্লেখিত আয়াতসমূহের তফসীর ও শানে-নযুল প্রসঙ্গে অনেক অসমর্থিত ইসরাঈলী রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়। সেসব রেওয়ায়েত পাঠ করে অনেক পাঠকরে মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়। হাকীমুল উম্মত মওলানা আশরাফ আলী থানবী (রাহঃ) সুস্পষ্ট ও সহজভঙ্গিতে এসব প্রশ্নের উত্তর দান করেছেন। তাঁর বর্ণনাকে যথেষ্ট মনে করে এখানে হুবহু উদ্ধৃত করে দিলাম।

(১) নির্বোধ ইহুদীরাই হযরত সুলায়মান (আঃ)-কে জাদুকর বলে আখ্যায়িত করত, তাই আল্লাহ্‌ তাআলা আয়াতের মাঝখানে তাঁর নিষ্কলুষতাও প্রকাশ করে দিয়েছেন।

(২) বর্ণিত আয়াতসমূহে ইহুদীদের নিন্দা করাই উদ্দেশ্য। কারণ, তাদের মধ্যে জাদুবিদ্যার চর্চা ছিল। এসব আয়াত সম্পর্কে পরামাসুন্দরী যোহ্‌রার একটি মুখরোচক কাহিনীও সুবিদিত রয়েছে। কাহিনীটি কোন নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা সমর্থিত নয়। শরীয়তের নীতি বিরুদ্ধ মনে করে অনেক আলেম কাহিনীটিকে নাকচ করে দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ একে সদর্থে ব্যাখ্যা করা শরীয়ত বিরুদ্ধ মনে না করে নাকচ করেননি। বাস্তবে কাহিনীটি সত্য কি মিথ্যা, এখানে তা আলোচনা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। তবে এটা ঠিক যে, আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কাহিনীর উপর নির্ভরশীল নয়।

(৩) সবকিছু জানা সত্ত্বেও ইহুদীরা আমল বা কাজ করত, 'এলম' বা জানার বিপরীত এবং এ ব্যাপারে তারা মোটেও বিচক্ষণতার পরিচয় দিত না। তাই আয়াতে প্রথমে তাদের জানার সংবাদ দেয়া হয়েছে এবং পরিশেষে 'যদি তরা জানত!' বলে না জানার কথাও বলা হয়েছে। কারণ, যে জানার সাথে তদনুরূপ কাজ ও বিচক্ষণতা যুক্ত হয় না, তা না জানারই শামিল।

(৪) ঠিক কখন, সে সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য জানা না থাকলেও এক সময়ে পৃথিবীতে বিশেষ করে বাবেল শহরে জাদু-বিদ্যার যথেষ্ট প্রচলন ছিল। জাদুর অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া দেখে মূর্খ লোকদের মধ্যে জাদু ও পয়গম্বরগণের মু'জেযার স্বরূপ সম্পর্কে বিভ্রান্তি দেখা দিতে থাকে। কেউ কেউ জাদুকরদেরও সজ্জন ও অনুসরণযোগ্য মনে করতে থাকে। এই বিভ্রান্তি দূর করার উদ্দেশে আল্লাহ্‌ তাআলা বাবেল শহরে 'হারূত' ও 'মারূত' নামে দু'জন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। তাদের কাজ ছিল জাদুর স্বরূপ ও ভেল্কিবাজি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা— যাতে বিভ্রান্তি দূর হয় এবং জাদুর আমল ও জাদুকরদের অনুসরণ থেকে তারা বিরত থাকতে পারে। পয়গম্বরগণের নবুওয়তকে যেমন মু'জেযা ও নিদর্শনাদি দ্বারা প্রমাণ করে দেয়া হয়, তেমনি হারূত ও মারূত যে ফেরেশতা, তার উপর যুক্তি-প্রমাণ খাড়া করে দেয়া হল, যাতে তাদের নির্দেশাবলী জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়।

একাজে পয়গম্বরগণকে নিযুক্ত না করার কারণ এই যে, প্রথমতঃ এতে পয়গম্বর ও জাদুকরদের মধ্যে পার্থক্য ফুটিয়ে তোলা উদ্দেশ্য ছিল। এদিক দিয়ে তারা যেন ছিলেন একটি পক্ষ। কাজেই উভয়পক্ষকে বাদ দিয়ে তৃতীয় পক্ষকে বিচারক নিযুক্ত করাই বিধেয়।

দ্বিতীয়তঃ জাদুর বাক্যাবলী মুখে উচ্চারণ ও বর্ণনা ব্যতীত এ কাজ সম্পন্ন করা সম্ভবপর ছিল না। যদিও 'কুফরে'র বর্ণনা কুফর নয়, এই স্বীকৃত নীতি অনুযায়ী পয়গম্বরগণ তা করতে পারতেন, তথাপি হেদায়েতের প্রতীক হওয়ার কারণে একাজে তাঁদের নিযুক্তি সমীচীন মনে

করা হয়নি। এ কাজের জন্য ফেরেশতাই মনোনীত হন। কারণ, সৃষ্টি জগতে ফেরেশতাদের দ্বারা এমন কাজও নেয়া হয়, যা সামগ্রিক উপযোগিতার দিক দিয়ে ভাল, কিন্তু অনিষ্টের কারণে স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে মন্দ। যেমন, কোন হিংস্র ও ইতর প্রাণীর লালন-পালন ও দেখাশুনা করা। সৃষ্টিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে একাজ সঠিক ও প্রশংসনীয়, কিন্তু জাগতিক কল্যাণ আইনের দৃষ্টিতে অঠিক ও নিন্দনীয়। পক্ষান্তরে পয়গম্বরগণকে শুধু জাগতিক কল্যাণমূলক আইন তদারকের কাজেই নিযুক্ত করা হয়— যা সাধারণতঃ ভাল কাজেই হয়ে থাকে। উপরোক্ত জাদুর উচ্চারণ ও বর্ণনা উদ্দেশের দিক দিয়ে জাগতিক কল্যাণমূলক কাজ হলেও জাদুর আমলে লিপ্ত হয়ে পড়ার (যেমন, বাস্তবে হয়েছে) ক্ষীণ সম্ভাবনার পরিপ্রেক্ষিতে পয়গম্বরগণকে এ থেকে দূরে রাখাই পছন্দ করা হয়েছে।

জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য ঃ পয়গম্বরদের মু'জেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও বাহ্যত তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরকেও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তার পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও কারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভুত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য অলৌকিক ঘটনারই মত। কোন দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও প্রাকৃতিক কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ্ তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোন হাত নেই। ইবরাহীম (আঃ)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ্ তাআলাই আদেশ করেছিলেন, 'ইবরাহীমের জন্য সুশীতল হয়ে যাও।' কিন্তু এতটুকু শীতল নয় যে, ইবরাহীম কষ্ট অনুভব করে।' আল্লাহ্র এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোন কোন লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জেযা নয় ; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোকা খায়।

স্বয়ং কোরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জেযা সরাসরি আল্লাহ্র কাজ। বলা হয়েছে –

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ

অর্থাৎ— আপনি যে একমুষ্টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে তা আপনি নিক্ষেপ করেননি, আল্লাহ্ নিক্ষেপ করেছিলেন। অর্থাৎ, এক মুষ্টি কঙ্কর যে সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোন হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহ্র কাজ। এই মু'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহ্র কাজ আর জাদু অদৃশ্য প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। এ প্রার্থক্যটিই মু'জেযা ও জাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, বাহ্যিক রূপ উভয়েরই এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বোঝার জন্যেও আল্লাহ্ তাআলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমতঃ মু'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাঁদের খোদাভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহ্র যিক্র থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জেযা ও জাদুর প্রার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত ঃ আল্লাহ্র চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও নবুওত দাবী করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুওয়তের দাবী ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

পয়গম্বরগণের উপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে 'ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। পয়গম্বরগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়তের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে পয়গম্বরগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ্ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদীরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল। মূসা (আঃ)-এর জাদুর প্রভাবে প্রভাবান্বিত হওয়া কোরআনেই উল্লেখিত রয়েছে — يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا

تَسْعَىٰ এবং فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُّوسَىٰ

জাদুর কারণেই মূসা (আঃ) – এর মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল।

শরীয়তে জাদু সম্পর্কিত বিধি বিধান

পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে, কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড, যাতে কুফর, শিরক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বিন ও শয়তানকে সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। কোরআনে বর্ণিত বাবেল শহরের জাদু ছিল তাই। – (জাস্‌সাস) এ জাদুকেই কোরআন কুফর বলে অভিহিত করেছে। আবু মনসুর (রহঃ) বলেন, বিশুদ্ধ অভিমত এই যে, জাদুর সকল প্রকারই কুফর নয়; বরং যাতে ঈমানের পরিপন্থী কথাবার্তা এবং কাজকর্ম অবলম্বন করা হয়, তাই কুফর। — (রূহুল আনী)।

আয়াত দ্বারা বোঝা যায় যে, আপনার কোন জায়েয কাজ থেকে যদি অন্যরা নাজায়েয কাজের আশকারা পায়, তবে সে জায়েয কাজটিও আপনার পক্ষে জায়েয থাকবে না। উদাহরণতঃ কোন আলেমের কোন জায়েয কাজ দেখে যদি সাধারণ লোকেরা বিভ্রান্ত হয় এবং নাজায়েয কাজে লিপ্ত হয়, তবে সে আলেমের জন্য সে জায়েয কাজটিও নিষিদ্ধ হয়ে যাবে। তবে শর্ত এই যে, সংশ্লিষ্ট কাজটি শরীয়তের দৃষ্টিতে জরুরী না হওয়া চাই। কোরআন ও হাদীসে এর ভুরি ভুরি দৃষ্টান্ত রয়েছে।

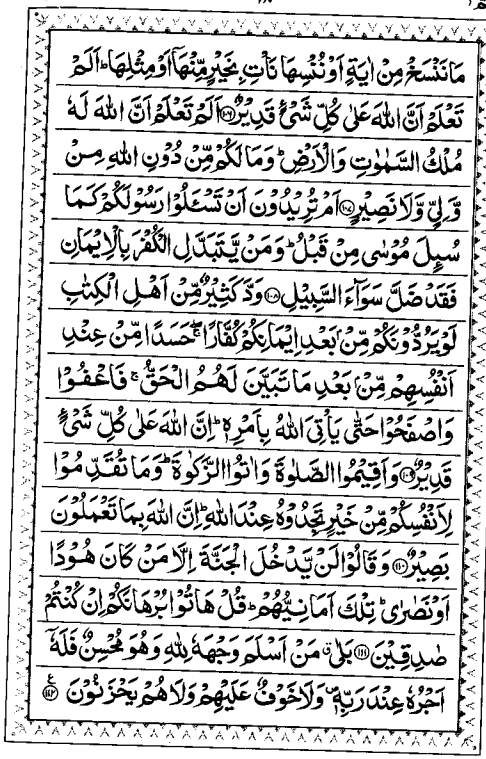

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَآ اَوْ مِثْلِهَا ؕ اَلَمْ
تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ ۝١٠٦ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ لَهٗ
مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ؕ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ
وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ۝١٠٧ اَمْ تُرِيْدُوْنَ اَنْ تَسْـَٔلُوْا رَسُوْلَكُمْ كَمَا
سُئِلَ مُوْسٰى مِنْ قَبْلُ ؕ وَمَنْ يَّتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْاِيْمَانِ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ السَّبِيْلِ ۝١٠٨ وَدَّ كَثِيْرٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ
لَوْ يَرُدُّوْنَكُمْ مِّنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ كُفَّارًا ۚ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ
اَنْفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۚ فَاعْفُوْا
وَاصْفَحُوْا حَتّٰى يَاْتِىَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ؕ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ
قَدِيْرٌ ۝١٠٩ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ ؕ وَمَا تُقَدِّمُوْا
لِاَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرٌ ۝١١٠ وَقَالُوْا لَنْ يَّدْخُلَ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا
اَوْ نَصٰرٰى ؕ تِلْكَ اَمَانِيُّهُمْ ؕ قُلْ هَاتُوْا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ
صٰدِقِيْنَ ۝١١١ بَلٰى ۚ مَنْ اَسْلَمَ وَجْهَهٗ لِلّٰهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهٗٓ
اَجْرُهٗ عِنْدَ رَبِّهٖ ۚ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝١١٢

(১০৬) আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্ সব কিছুর উপর শক্তিমান? (১০৭) তুমি কি জান না যে, আল্লাহ্র জন্যই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের আধিপত্য? আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধু ও সাহায্যকারী নেই। (১০৮) ইতিপূর্বে মূসা (আঃ) যেমন জিজ্ঞাসিত হয়েছিলেন, (মুসলমানগণ,) তোমরাও কি তোমাদের রসূলকে তেমনি প্রশ্ন করতে চাও? যে কেউ ঈমানের পরিবর্তে কুফর গ্রহণ করে, সে সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়। (১০৯) আহ্লে কিতাবদের অনেকেই প্রতিহিংসাবশতঃ চায় যে, মুসলমান হওয়ার পর তোমাদেরকে কোন রকমে কাফির বানিয়ে দেয়। তাদের কাছে সত্য প্রকাশিত হওয়ার পর (তারা এটা চায়)। যাক তোমরা আল্লাহ্র নির্দেশ আসা পর্যন্ত তাদের ক্ষমা কর এবং উপেক্ষা কর। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। (১১০) তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর এবং যাকাত দাও। তোমরা নিজের জন্যে পূর্বে যে সৎকর্ম প্রেরণ করবে, তা আল্লাহ্র কাছে পাবে। তোমরা যা কিছু কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা প্রত্যক্ষ করেন। (১১১) ওরা বলে, ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান ব্যতীত কেউ জান্নাতে যাবে না। এটা ওদের মনের বাসনা। বলে দিন, তোমরা সত্যবাদী হলে, প্রমাণ উপস্থিত কর। (১১২) হাঁ, যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহ্র উদ্দেশে সমর্পণ করেছে এবং সে সৎকর্মশীলও বটে তার জন্য তার পালনকর্তার কাছে পুরস্কার রয়েছে। তাদের ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।

ইহুদীদের দাবী ছিল দু'টিঃ (এক) ইহুদীবাদ ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠ। (দুই) তারা মুসলমানদের শুভাকাঙ্খী। প্রথম দাবীটি তারা প্রমাণ করতে পারেনি। নিছক দাবীতে কিছু হয় না। এছাড়া দাবীটি নিরর্থকও বটে। কারণ, 'নাসিখ' (যে রহিত করে) আগমন করলে 'মনসূখ' (যাকে রহিত করা হয়) বর্জনীয় হয়ে যায়। তা উত্তম ও অধমের পার্থক্যের উপর নির্ভরশীল নয়। এই উত্তরটি সুস্পষ্ট ও সর্বজনবিদিত, এ কারণে আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়নি। আয়াতে শুধু দ্বিতীয় দাবীটি নিয়েই আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়বস্তুকে শক্তিশালী ও জোরদার করার উদ্দেশে আহ্লে-কিতাবদের সাথে মুশরিকদের উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মুশরিকরা যেমন নিশ্চিতরূপেই তোমাদের হিতাকাঙ্খী নয়, তাদেরকেও তেমনি মনে কারো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا —এই আয়াতে কোরআনী আয়াত রহিত হওয়ার সম্ভাব্য সকল প্রকারই সন্নিবেশিত রয়েছে। অভিধানে 'নস্খ' শব্দের অর্থ দূর করা, লিখা। সমস্ত মুসলিম টীকাকার এ বিষয়ে একমত যে, আয়াতে 'নস্খ' শব্দ দ্বারা বিধি-বিধান দূর করা —অর্থাৎ, রহিত করাকে বোঝানো হয়েছে। এ কারণেই হাদীস ও কোরআনের পরিভাষায় এক বিধানের স্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করাকে 'নস্খ' বলা হয়। 'অন্য বিধানটি' কোন বিধানের বিলুপ্তি ঘোষণাও হতে পারে, আবার এক বিধানের পরিতর্তে অপর বিধান প্রবর্তনও হতে পারে।

আল্লাহ্র বিধানে নস্খের স্বরূপ ঃ জগতের রাষ্ট্র ও আইন-আদালতে এক নির্দেশকে রহিত করে অন্য নির্দেশ জারী করার ব্যাপারটি সর্বজনবিদিত। রচিত আইনে 'নস্খ' বিভিন্ন কারণে হয়ে থাকে। (১) ভুল ধারণার উপর নির্ভর করে প্রথমে যদি কোন অইন প্রবর্তন করা হয়, তবে পরে বিষয়টির প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটিত হলে পূর্বেকার অইন পরিবর্তন করা হয়। (২) ভবিষ্যত অবস্থার গতি-প্রকৃতি জানা না থাকার কারণে কোন কোন সাময়িক আইন জারী করা হয়। পরে অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সাথে সে আইনও পরিবর্তন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের নস্খ আল্লাহ্র আইনে হতে পারে বলে ধারণা করা যায় না।

তৃতীয় প্রকার 'নস্খ' এরূপ ঃ আইন-রচয়িতা আগেই জানে যে, অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন এই আইন আর উপযোগী থাকবে না, অন্য আইন জারী করতে হবে। এরূপ জানার পর সাময়িকভাবে এই আইন জারী করে দেন, পরে পূর্বজ্ঞান আনুযায়ী যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তখন পূর্বসিদ্ধান্ত অনুযায়ী আইনও পরিবর্তন করেন। উদাহরণতঃ রোগীর বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে চিকিৎসক ব্যবস্থাপত্র দেন। তিনি জানেন, যে, এই ওষুধ দু'দিন সেবন করার পর রোগীর অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং তখন অন্য ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে। অবস্থার এহেন পরিবর্তন জানার ফলেই চিকিৎসক প্রথম দিন এক ওষুধ এবং পরে অন্য ওষুধ দেন।

অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রথম দিনেই পরিবর্তনসহ চিকিৎসার পূর্ণ প্রোগ্রাম কাগজে লিখে দিতে পারে যে, দুদিন এই ওষধ, তিন দিন অন্য ওষুধ এবং এক সপ্তাহ পর অমুক ওষুধ সেব্য। কিন্তু এরূপ করা হলে রোগীর পক্ষে জটিলতার সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং এতে ভুল বোঝাবুঝির

কারণে ত্রুটিরও আশঙ্কা থাকে। তাই ডাক্তার প্রথম দিনেই পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করেন না।

আল্লাহ্‌র আইনে এবং আসমানী গ্রন্থসমূহে শুধুমাত্র তৃতীয় প্রকার নসখই হতে পারে এবং হয়ে থাকে। প্রতিটি নবুওয়ত ও প্রতিটি আসমানী গ্রন্থ পূর্ববর্তী নবুওত ও আসমানী গ্রন্থের বিধান নস্‌খ তথা রহিত করে নতুন বিধান জারী করেছে। এমনিভাবে একই নবুওয়ত ও শরীয়তে এমন রয়েছে যে, এক বিধান কিছু দিন প্রচলিত থাকার পর খোদায়ী হেকমত অনুযায়ী সেটি পরিবর্তন করে তদস্থলে অন্য বিধান প্রবর্তন করা হয়েছে। সহীহ্ মুসলিমের হাদীসে আছেঃ لم تكن نبوة قط الا تناسخت – অর্থাৎ, এমন নবুওয়ত কখনও ছিল না, যাতে নস্‌খ ও পরিবর্তন করা হয়নি। – (কুরতুবী) বিধান পরিবর্তন সংক্রান্ত বিস্তারিত জানার জন্য উসূলে ফেকাহ দ্রষ্টব্য)

এখানে 'অন্যায় আবদার' বলার কারণ এই যে, প্রতিটি কাজেই আল্লাহ্ তাআলার হেকমত ও উপযোগিতা নিহিত থাকে। তাতে পন্থা নির্দেশ করার কোন অধিকার বান্দার নেই যে, সে বলবে, একাজটি এভাবে করা হোক।

জ্ঞাতব্য ঃ তখনকার অবস্থানুযায়ী ক্ষমার নির্দেশই ছিল বিধেয়। পরবর্তীকালে আল্লাহ্ স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন এবং জেহাদের আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়। অতঃপর ইহুদীদের প্রতিও আইন বলবৎ করা হয় এবং অপরাধের ক্রমানুপাতে দুষ্টদের হত্যা, নির্বাসন, জিযিয়া আরোপ ইত্যাদি শাস্তি দেয়া হয়।

আলোচ্য আয়াতসমূহে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের পারস্পরিক মতবিরোধের উল্লেখ করে তাদের নিবুদ্ধিতা ও মতবিরোধের কুফল বর্ণনা করেছেন। অতঃপর আসল সত্য উদঘাটন করেছেন। এসব ঘটনায় মুসলমানদের জন্যে গুরুত্বপূর্ণ হেদায়েত (পথনির্দেশ) নিহিত রয়েছে যা পরে বর্ণিত হবে।

খ্রীষ্টান ও ইহুদী উভয় সম্প্রদায়ই ধর্মের প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে ধর্মের নাম-ভিত্তিক জাতীয়তা গড়ে তুলেছিল এবং তারা প্রত্যেকেই স্বজাতিকে জান্নাতি ও আল্লাহ্‌র প্রিয়পাত্র বলে দাবী করতো এবং তাদের ছাড়া অন্যান্য সমস্ত জাতিকে জাহান্নামী ও পথভ্রষ্ট বলে বিশ্বাস করত।

এ অযৌক্তিক মতবিরোধের ফলশ্রুতিতেই মুশরিকরা একথা বলার সুযোগ পেল যে, খ্রীষ্টধর্ম ও ইহুদীধর্ম উভয়টিই মিথ্যা ও বানোয়াট এবং ওদের মূর্তি পূজাই একমাত্র সত্য ও বিশুদ্ধ ধর্ম।

আল্লাহ্ তাআলা উভয় সম্প্রাদায়ের মূর্খতা সম্পর্কে মন্তব্য করছেন যে, এরা উভয় জাতিই জান্নাতে যাওয়ার প্রকৃত কারণ সম্পর্কে উদাসীন; তারা শুধু ধর্মের নাম ভিত্তিক জাতীয়তার অনুসরণ করে। বস্তুতঃ ইহুদী-খ্রীষ্টান অথবা ইসলাম যে কোন ধর্ম হোক, সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে দু'টি বিষয়ঃ

(এক) বান্দা মনে-প্রাণে নিজেকে আল্লাহ্‌র কাছে সমর্পন করবে। তাঁর আনুগত্যকেই নিজের মত ও পথ মনে করবে। এ উদ্দেশ্যটি যে ধর্মে অর্জিত হয় তা'ই প্রকৃত ধর্ম। ধর্মের প্রকৃত স্বরূপকে পেছনে ফেলে ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান জাতীয়তাবাদের ধ্বজা ধরে থাকা ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞতারই পরিচায়ক।

(দুই) যদি কেউ মনে-প্রাণে আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের সংকল্প গ্রহণ করে কিন্তু আনুগত্য ও এবাদত নিজ খেয়াল-খুশীমত মনগড়া পন্থায় সম্পাদন করে, তবে তাও জান্নাতে যাওয়ার জন্যে যথেষ্ট নয়, বরং এক্ষেত্রেও আনুগত্য ও এবাদতের সে পন্থাই অবলম্বন করতে হবে, যা আল্লাহ্ তাআলা রসূলের মাধ্যমে বর্ণনা ও নির্ধারণ করেছে।

প্রথম বিষয়টি بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ বাক্যাংশের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয় বিষয়টি وَهُوَ مُحْسِنٌ বাক্যাংশের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। এতে জানা গেল যে, পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতে প্রবেশের জন্য আনুগত্যের সংকল্পই যথেষ্ট নয়, বরং সৎকর্মও প্রয়োজন। বস্তুতঃ কোরআন ও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্‌র সাথে সামঞ্জস্যশীল শিক্ষা ও পন্থাই সৎকর্ম।

وَقَالَتِ الْيَهُوْدُ لَيْسَتِ النَّصٰرٰى عَلٰى شَيْءٍ ۖ وَّقَالَتِ النَّصٰرٰى
لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ ۙ وَّهُمْ يَتْلُوْنَ الْكِتٰبَ ۗ كَذٰلِكَ قَالَ
الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ ۚ فَاللّٰهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فِيْمَا كَانُوْا فِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿١١٣﴾ وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ
مَّنَعَ مَسٰجِدَ اللّٰهِ اَنْ يُّذْكَرَ فِيْهَا اسْمُهٗ وَسَعٰى فِيْ خَرَابِهَا ۗ
اُولٰٓئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ يَّدْخُلُوْهَآ اِلَّا خَآئِفِيْنَ ۗ لَهُمْ فِي
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَّلَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ ﴿١١٤﴾ وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ
وَالْمَغْرِبُ ۚ فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ وَاسِعٌ
عَلِيْمٌ ﴿١١٥﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهٗ ۗ بَلْ لَّهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ۗ كُلٌّ لَّهٗ قٰنِتُوْنَ ﴿١١٦﴾ بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۗ وَ
اِذَا قَضٰٓى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿١١٧﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ
لَا يَعْلَمُوْنَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللّٰهُ اَوْ تَاْتِيْنَآ اٰيَةٌ ۗ كَذٰلِكَ
قَالَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِّثْلَ قَوْلِهِمْ ۘ تَشَابَهَتْ قُلُوْبُهُمْ ۗ
قَدْ بَيَّنَّا الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يُّوْقِنُوْنَ ﴿١١٨﴾ اِنَّآ اَرْسَلْنٰكَ بِالْحَقِّ
بَشِيْرًا وَّنَذِيْرًا ۙ وَّلَا تُسْـَٔلُ عَنْ اَصْحٰبِ الْجَحِيْمِ ﴿١١٩﴾

(১১৩) ইহুদীরা বলে, খ্রীস্টানরা কোন ভিত্তির উপরেই নয় এবং খ্রীস্টানরা বলে, ইহুদীরা কোন ভিত্তির উপরেই নয়। অথচ ওরা সবাই কিতাব পাঠ করে। এমনিভাবে যারা মূর্খ, তার ও ওদের মতই উক্তি করে। অতএব, আল্লাহ্ কেয়ামতের দিন তাদের মধ্যে ফয়সালা দেবেন, যে বিষয়ে তারা মতবিরোধ করছিল। (১১৪) যে ব্যক্তি আল্লাহ্র মসজিদসমূহে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে বাধা দেয় এবং সেগুলোকে উজাড় করতে চেষ্টা করে, তার চাইতে বড় যালেম আর কে? এদের পক্ষে মসজিদসমূহে প্রবেশ করা বিধেয় নয়, অবশ্য ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায়। ওদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা এবং পরকালে কঠিন শাস্তি রয়েছে। (১১৫) পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই। অতএব, তোমরা যেদিকেই মুখ ফেরাও, সেদিকেই আল্লাহ্ বিরাজমান। নিশ্চয় আল্লাহ্ সর্বব্যাপী, সর্বজ্ঞ। (১১৬) তারা বলে, আল্লাহ্ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি তো এসব কিছু থেকে পবিত্র; বরং নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর আজ্ঞাধীন (১১৭) তিনি নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উদ্ভাবক। যখন তিনি কোন কার্য সম্পাদনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন সেটিকে একথাই বলেন, 'হয়ে যাও', তৎক্ষণাৎ তা হয়ে যায়। (১১৮) যারা কিছু জানে না, তারা বলে, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে কেন কথা বলেন না। অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন কেন আসে না? এমনিভাবে তাদের পূর্বে যারা ছিল তারাও তাদেরই অনুরূপ কথা বলেছে। তাদের অন্তর একই রকম। নিশ্চয় আমি উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেছি তাদের জন্যে, যারা প্রত্যয়শীল। (১১৯) নিশ্চয় আমি আপনাকে সত্য ধর্মসহ সুসংবাদদাতা ও ভীতি প্রদর্শনকারীরূপে পাঠিয়েছি। আপনি দোযখবাসীদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন না।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আল্লাহ্র কাছে বংশগত ইহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানের কোন মূল্য নেই; গ্রহণীয় বিষয় হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম ঃ ইহুদী হউক, অথবা খ্রীষ্টান কিংবা মুসলমান— যে কেউ উপরোক্ত মৌলিক বিষয়াদির মধ্য থেকে কোন একটি ছেড়ে দেয়, অতঃপর শুধু নামভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে নিজেদেরকে জান্নাতের একমাত্র উত্তরাধিকারী মনে করে নেয়, সে আত্ম প্রবঞ্চনা বৈ কিছুই করে না; আসল সত্যের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এসব নামের উপর ভরসা করে কেউ আল্লাহ্র নিকটবর্তী ও মকবুল হতে পারবে না, যে পর্যন্ত না তার মধ্যে ঈমান ও সৎকর্ম থাকে।

প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়তেই ঈমানের মূলনীতি এক ও অভিন্ন। তবে সৎকর্মের আকার-আকৃতিতে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হয়েছে। তওরাতের যুগে যেসব কাজকর্ম মূসা (আঃ) ও তওরাতের শিক্ষার অনুরূপ ছিল, তা'ই ছিল সৎকর্ম। তদ্রূপ ইঞ্জীলের যুগে নিশ্চিতরূপে তা'ই ছিল সৎকর্ম, যা হযরত ঈসা (আঃ) ও ইঞ্জীলের শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যশীল ছিল। এখন কোরআনের যুগে ঐসব কার্যকলাপই সৎকর্ম রূপে অভিহিত হওয়ার যোগ্য, যা সর্বশেষ পয়গম্বর (সাঃ)-এর বাণী ও তৎকর্তৃক আনীত গ্রন্থ কোরআন মজীদের হেদায়েতের অনুরূপ।

মোটকথা, ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের মতবিরোধ সম্পর্কে আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালা এই যে, উভয় সম্প্রাদায় মূর্খতাসুলভ কথাবার্তা বলেছে, তাদের কেউই জান্নাতের ইজারাদার নয়। তাদের কারও ধর্ম ভিত্তিহীন ও বানোয়াট নয়; বরং উভয় ধর্মের নির্ভুল ভিত্তি রয়েছে। ভুল বোঝাবুঝির প্রকৃত কারণ হচ্ছে এই যে, ওরা ধর্মের আসল প্রাণ অর্থাৎ বিশ্বাস, সৎকর্ম ও সত্য মতবাদকে বাদ দিয়ে বংশ অথবা দেশের ভিত্তিতে কোন সম্প্রদায়কে ইহুদী আর কোন সম্প্রাদায়কে খ্রীষ্টান নামে অভিহিত করেছে।

যারা ইহুদীদের বংশধর অথবা ইহুদী নগরীতে বাস করে অথবা আদমশুমারীতে নিজেকে ইহুদী বলে প্রকাশ করে, তাদেরকেই ইহুদী মনে করে নেয়া হয়েছে। তেমনিভাবে খ্রীষ্টানদের পরিচিতি ও সংখ্যা নিরূপণ করা হয়েছে। অথচ ঈমানের মূলনীতি ভঙ্গ করে এবং সৎকর্ম থেকে বিমুখ হয়ে কোন ইহুদীই ইহুদী এবং কোন খ্রীষ্টানই খ্রীষ্টান থাকতে পারে না।

কোরআন মজীদে আহ্লে-কিতাবদের মতবিরোধ ও আল্লাহ্র ফয়সালা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হল মুসলমানদের সতর্ক করা, যাতে তারাও ভুল বোঝাবুঝিতে লিপ্ত হয়ে একথা না বলে যে, আমরা পুরুষানুক্রমে মুসলমান, প্রত্যেক অফিসে ও রেজিষ্টারে আমাদের নাম মুসলমানদের কোটায় লিপিবদ্ধ এবং আমরা মুখেও নিজেদের মুসলমান বলি, সুতরাং জান্নাত এবং নবী (সাঃ)-এর মাধ্যমে মুসলমানদের সাথে ওয়াদাকৃত সকল পুরস্কারের যোগ্য হকদার আমরাই।

এই ফয়সালা দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, শুধু দাবী করলে, মুসলমানরূপে নাম লিপিবদ্ধ করালে অথবা মুসলমানের ঔরসে কিংবা মুসলমানদের আবাসভূমিতে জন্মগ্রহণ করলেই প্রকৃত মুসলমান হয় না, বরং মুসলমান হওয়ার জন্যে পরিপূর্ণরূপে ইসলাম গ্রহণ করা অপরিহার্য। ইসলামের অর্থ আত্মসমর্পণ। দ্বিতীয়তঃ সৎকর্ম অর্থাৎ, সুন্নাহ্ অনুযায়ী আমল করাও জরুরী।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, কোরআন মজীদের এই হুশিয়ারী সত্ত্বেও অনেক মুসলমান উপরোক্ত ইহুদী ও খ্রীষ্টানী ভ্রান্তির শিকার হয়ে পড়েছে। তারা আল্লাহ্, রসূল, পরকাল ও কেয়ামতের ব্যাপারে উদাসীন হয়ে বংশগত মুসলমান হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করতে শুরু করেছে। কোরআন

ও হাদীসে ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সাফল্য সম্পর্কে মুসলমানদের সাথে যেসব অঙ্গীকার করা হয়েছে, তারা নিজেকে সেগুলোর যোগ্য হকদার মনে করে সেগুলোর পূর্ণ হওয়ার অপেক্ষা করছে। অতঃপর সেগুলো পূর্ণ হওয়ার লক্ষণ দেখতে না পেয়ে কোরআন ও হাদীসের অঙ্গীকার সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তারা লক্ষ্য করে না যে, কোরআন নিছক বংশগত মুসলমানদের সাথে কোন অঙ্গীকার করেনি— যতক্ষণ না তারা নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রসূল (সাঃ)-এর ইচ্ছার অধীন করে দেয়। بَلٰى مَنْ اَسْلَمَ আয়াতের সারমর্ম তাই।

আজকাল সমগ্র বিশ্বের মুসলমান নানাবিধ বিপদাপদ ও সঙ্কটে নিমজ্জিত। অনেক অর্বাচীনের ধারণা, এ অবস্থার জন্যে সম্ভবতঃ আমাদের ইসলামই দায়ী। কিন্তু উপরোক্ত বর্ণনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, ইসলাম নয় বরং ইসলামকে পরিহার করাই এর জন্য দায়ী। আমরা ইসলামের শুধু নামটুকু রেখেছি; আমাদের মধ্যে ইসলামের বিশ্বাস, চরিত্র, আমল ইত্যাদি কিছুই নেই।

এখানে প্রশ্ন হয় যে, আমরা যাই আছি, ইসলামেরই নাম নেই এবং আল্লাহ্ তাআলা ও রসূল (সাঃ)-কেই স্মরণ করি। পক্ষান্তরে যেসব কাফের খোলাখুলিভাবে আল্লাহ্ ও রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং ইসলামের নাম মুখে উচ্চারণ করাও পছন্দ করে না, তারাই আজ বিশ্বের বুকে সব দিক দিয়ে উন্নত, তারাই বিশাল রাষ্ট্রের অধিকারী এবং তারাই বিশ্বের শিল্প ও ব্যবসায়ের একচ্ছত্র অধিপতি। দুষ্কর্মের শাস্তি হিসেবেই যদি আজ আমরা সর্বত্র লাঞ্ছিত ও পদদলিত, তবে কাফের ও পাপাচারীদের সাজা আরও বেশী হওয়া উচিত। কিন্তু সামান্য চিন্তা করলেই এ প্রশ্নেরও অবসান হয়ে যায়।

প্রথমতঃ এর কারণ এই যে, মিত্র ও শত্রুর সাথে একই রকম ব্যবহার করা হয় না। মিত্রের দোষ পদে পদে ধরা হয়। নিজ সন্তান ও শিষ্যকে সামান্য বিষয়ে শাস্তি দেয়া হয়। কিন্তু শত্রুর সাথে তেমনি ব্যবহার করা হয় না। তাকে অবকাশ দেয়া হয় এবং সময় আসলে হঠাৎ পাকড়াও করা হয়।

মুসলমান যতক্ষণ ঈমান ও ইসলামের নাম উচ্চারণ করে, আল্লাহ্র মাহাত্ম্য ও ভালবাসা দাবী করে, ততক্ষণ সে বন্ধুরই তালিকাভুক্ত থাকে। ফলে তার মন্দ আমলের সাজা সাধারণতঃ দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হয়— যাতে পরকালের বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হয়ে যায়। কাফেরের অবস্থা এর বিপরীত। সে বিদ্রোহী ও শত্রুর আইনের অধীন। দুনিয়াতে হালকা শাস্তি দিয়ে তার শাস্তির মাত্রা হ্রাস করা হয় না। তাকে পুরোপুরি শাস্তির মধ্যেই নিক্ষেপ করা হবে। 'দুনিয়া মুমিনের জন্যে বন্দীশালা, আর কাফেরদের জন্যে জান্নাত।'— মহানবী (সাঃ)-এর এ উক্তির তাৎপর্যও তাই।

মুসলমানদের অবনতি ও অস্থিরতা এবং কাফেরদের উন্নতি ও প্রশান্তির মূলে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক কর্মের ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এক কর্ম দ্বারা অন্য কর্মের বৈশিষ্ট্য অর্জিত হতে পারে না। উদাহরণতঃ ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আর্থিক উন্নতি আর ওষুধপত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শারীরিক সুস্থতা। এখন যদি কেউ দিবারাত্র ব্যবসায়ে মগ্ন থাকে, অসুস্থতা ও তার চিকিৎসার প্রতি মনোযোগ না দেয়, তবে শুধু ব্যবসায়ের কারণে সে রোগের কবল থেকে মুক্তি পেতে পারে না। এমনিভাবে কেউ ওষুধপত্র ব্যবহার করেই ব্যবসায়ের বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ, আর্থিক উন্নতি লাভ করতে পারে না। কাফেরদের পার্থিব উন্নতি এবং আর্থিক প্রাচুর্য তাদের কুফরের ফলশ্রুতি নয়, যেমন মুসলমানদের দারিদ্র্য ও অস্থিরতা ইসলামের ফলশ্রুতি নয়। বরং কাফেররা যখন পরকালের চিন্তা-ভাবনা পরিহার করে পরিপূর্ণভাবে জাগতিক অর্থ-সম্পদ ও আরাম-আয়েশের পেছনে আত্মনিয়োগ করেছে— ব্যবসা শিল্প, কৃষি ও রাজনীতির লাভজনক পন্থা অবলম্বন করছে এবং ক্ষতিকর পন্থা থেকে বিরত থাকছে, তখনই তারা জগতে উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হচ্ছে। তারাও যদি আমাদের মত ধর্মের নাম নিয়ে বসে থাকত এবং জাগতিক উন্নতির লক্ষ্যে যথাবিহিত চেষ্টা-সাধণা না করত, তবে তাদের কুফর তাদেরকে অর্থ-সম্পদ ও রাষ্ট্রের মালিক বানাতে পারত না। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে আশা করতে পারি যে, আমাদের (তথাকথিত নামের) ইসলাম আমাদের সামনে সকল বিজয়ের দ্বার উন্মুক্ত করে দেবে? ইসলাম ও ঈমান সঠিক মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও তার আসল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পারলৌকিক মুক্তি ও জান্নাতের অফুরন্ত শান্তি। উপযুক্ত চেষ্টা-সাধণা না করা হলে ইসলাম ও ঈমানের ফলশ্রুতিতে জগতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য ও আরাম-আয়েশের প্রাচুর্য লাভ করা অবশ্যম্ভাবী নয়।

একথা অভিজ্ঞতার দ্বারা প্রমাণিত যে, যে কোন দেশে যে কোন মুসলমান যদি ব্যবসা, শিল্প ও রাজনীতির বিশুদ্ধ মূলনীতি শিক্ষা করে তদনুযায়ী কাজ করে, তবে সেও কাফেরদের অর্জিত জাগতিক ফলাফল লাভে বঞ্চিত হয় না।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতসমূহ থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ঈমান ও সৎকর্ম পূর্ণরূপে অবলম্বন না করলে শুধু বংশগতভাবে ইসলামের নাম ব্যবহারের দ্বারা কোন শুভ ফল আশা করা যায় না।

আলোচ্য ১১৪ ও ১১৫ নং আয়াতদ্বয়ে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। প্রথম আয়াতটি একটি বিশেষ ঘটনা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে।

ঘটনাটি এই যে, ইসলাম-পূর্বকালে ইহুদীরা হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-কে হত্যা করলে খ্রীষ্টানরা তার প্রতিশোধ গ্রহণে বদ্ধপরিকর হয়। তারা ইরাকের একজন অগ্নি-উপাসক সম্রাটের সাথে মিলিত হয়ে সম্রাট তায়তাসের নেতৃত্বাধীন সিরিয়ার ইহুদীদের উপর আক্রমণ চালায়— তাদের হত্যা ও লুণ্ঠন করে, তওরাতের কপিসমূহ জ্বালিয়ে ফেলে, বায়তুল মোকাদ্দাসে আবর্জনা ও শূকর নিক্ষেপ করে, মসজিদের প্রাচীর ক্ষত-বিক্ষত করে সমগ্র শহরটিকে জন-মানবহীন বিরানায় পরিণত করে দেয়। এতে ইহুদীদের শক্তি পদদলিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। মহানবী (সাঃ)-এর আমল পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাস এমনিভাবে পরিত্যক্ত ও বিধ্বস্ত অবস্থায় ছিল।

ফারূকে আযম হযরত ওমর (রাঃ)-এর খেলাফত আমলে যখন সিরিয়া ও ইরাক বিজিত হয়, তখন তাঁরই নির্দেশক্রমে বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনঃনির্মিত হয়। এরপর দীর্ঘকাল পর্যন্ত সমস্ত সিরিয়া ও বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের অধিকারে ছিল। অতঃপর বায়তুল-মোকাদ্দাস মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয় এবং প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের অধিকারে থাকে। অবশেষে হিজরী ষষ্ঠ শতকে সুলতান সালাহউদ্দিন আইয়্যুবী বায়তুল-মোকাদ্দাস পুনরুদ্ধার করেন।

এ আয়াত থেকে কতিপয় প্রয়োজনীয় মাসআলা এবং বিধানও প্রমাণিত হয়।

প্রথমতঃ শিষ্টতা প্রদর্শনের ক্ষেত্রে বিশ্বের সকল মসজিদ একই পর্যায়ভুক্ত। বায়তুল-মোকাদ্দাস, মসজিদে-হারাম ও মসজিদে-নববীর অবমাননা, যেমনি বড় যুলুম, তেমনি অন্যান্য মসজিদের বেলায়ও তা

সমভাবে প্রযোজ্য। তবে এই তিনটি মসজিদের বিশেষ মাহাত্ম্য ও সম্মান স্বতন্ত্রভাবে স্বীকৃত। মসজিদে-হারামে এক রাকআত নামাযের সওয়াব একলক্ষ রাকআত নামাযের সমান এবং মসজিদেনবভী ও বায়তুল-মোকাদ্দাসে পঞ্চাশ হাজার রাকআত নাযের সমান। এই তিন মসজিদে নামায পড়ার উদ্দেশে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে পৌছা বিরাট সওয়াব ও বরকতের বিষয়। কিন্তু অন্য কোন মসজিদে নামায পড়া উত্তম মনে করে দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে আসতে বারণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মসজিদে যিকর ও নামাযে বাধা দেয়ার যত পন্থা হতে পারে সে সবগুলোই হারাম। তন্মধ্যে একটি প্রকাশ্য পন্থা এই যে, মসজিদে গমন করতে অথবা সেখানে নামায ও তেলাওয়াত করতে পরিস্কার ভাষায় নিষেধাজ্ঞা প্রদান। দ্বিতীয় পন্থা এই যে, মসজিদে হট্টগোল করে অথবা আশে-পাশে গান-বাজনা করে মুসল্লীদের নামায ও যিকরে বিঘ্ন সৃষ্টি করা।

এমনিভাবে নামাযের সময়ে যখন মুসল্লীরা নফল নামায, তসবীহ্, তেলাওয়াত ইত্যাদিতে নিয়োজিত থাকেন, তখন মসজিদে সরবে তেলাওয়াত ও যিকর করা এবং নামাযীদের নামাযে বিঘ্ন সৃষ্টি করাও বাধা প্রাদনেরই নামান্তর। এ কারণেই ফিকাহ্‌বিদগণ একে না-জায়েয আখ্যা দিয়েছেন। তবে, মসজিদে যখন মুসল্লী না থাকে, তখন সরবে যিকর অথবা তেলাওয়াত করায় দোষ নেই।

এ থেকে আরও বোঝা যায় যে, যখন মুসল্লীরা নামায, তসবীহ্ ইত্যাদিতে ব্যস্ত থাকে, তখন মসজিদে নিজের জন্যে অথবা কোন ধর্মীয় কাজের জন্যে চাঁদা সংগ্রহ করাও নিষিদ্ধ।

তৃতীয়তঃ মসজিদ জনশূন্য করার জন্য সম্ভবপর যত পন্থা হতে পারে সবই হারাম। খোলাখুলিভাবে মসজিদকে বিধ্বস্ত করা ও জনশূন্য করা যেমনি এর অন্তর্ভুক্ত তেমনিভাবে এমন কারণ সৃষ্টি করাও এর অন্তর্ভুক্ত, যার ফলে মসজিদ জনশূন্য হয়ে পড়ে। মসজিদ জনশূন্য হওয়ার অর্থ এই যে, সেখানে নামায পড়ার জন্যে কেউ আসে না কিংবা নামাজীর সংখ্যা হ্রাস পায়।

মোটকথা, وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ আয়াতটিতে কেবলামুখী হওয়ার পূর্ণ স্বরূপ বর্ণনা করে দেয়া হয়েছে যে, এর উদ্দেশ্য (নাউযুবিল্লাহ্) বায়তুল্লাহ্ অথবা বায়তুল-মোকাদ্দাসের পূজা করা নয়, কিংবা এ'দুটি স্থানের সাথে আল্লাহ্‌র পবিত্র সত্তাকে সীমিত করে নেয়াও নয়। তাঁর সত্তা সমগ্র বিশ্বকে বেষ্টন করে রেখেছে এবং সর্বত্রই তাঁর মনোযোগ সমান। এরপরও বিভিন্ন তাৎপর্যের কারণে বিশেষ স্থান অথবা দিককে কেবলা নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

আয়াতের এই বিষয়বস্তুকে সুস্পষ্ট ও অন্তরে বদ্ধমূল করার উদ্দেশেই সম্ভবতঃ হুযূরে আকরাম (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামকে হিজরতের প্রথম দিকে ষোল-সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়। এভাবে কার্যতঃ বলে দেয়া হয় যে, আমার মনোযোগ সর্বত্র রয়েছে। নফল নামাযসমূহের এক পর্যায়ে এই নির্দেশ অব্যাহত রাখা হয়েছে। সফরে কোন ব্যক্তি উট, ঘোড়া ইত্যাদি যানবাহনে সওয়ার হয়ে পথ চললে তাকে তদবস্থায় ইশারায় নফল নামায পড়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে। তার জন্য যানবাহন যেদিকে চলে সেদিকে মুখ করাই যথেষ্ট।

কোন কোন মুফাস্সীর فَاَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللّٰهِ আয়াতকে এই নফল নামাযেরই বিধান বলে সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখা দরকার যে, এই বিধান সে সমস্ত যানবাহনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যাতে সওয়ার হয়ে চলার সময় কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন। পক্ষান্তরে যেসব যানবাহনে সওয়ার হলে কেবলার দিকে মুখ করা কঠিন নয়, যেমন রেলগাড়ী, সামুদ্রীক জাহাজ, উড়োজাহাজ ইত্যাদিতে নফল নামাযেও কেবলার দিকেই মুখ করতে হবে। তবে নামাযরত অবস্থায় রেলগাড়ী অথবা জাহাজের দিক পরিবর্তন হয়ে গেলে এবং আরোহীর পক্ষে কেবলার দিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়ার অবকাশ না থাকলে তদবস্থায়ই নামায পূর্ণ করবে।

এমনিভাবে কেবলার দিক সম্পর্কে নামাযীর জানা না থাকলে, রাত্রির অন্ধকারে দিক নির্ণয় করা কঠিন হলে এবং বলে দেয়ার লোক না থাকলে সেখানেও নামাযী অনুমান করে যেদিকেই মুখ করবে, সেদিকই তার কেবলা বলে গণ্য হবে। নামায আদায় করার পর যদি দিকটি ভ্রান্তও প্রমাণিত হয়, তবুও তার নামায শুদ্ধ হয়ে যাবে— পুণর্বার পড়তে হবে না।

জ্ঞাতব্য ঃ (১) বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ ফেরেশতা নিযুক্ত করা— যেমন, বৃষ্টিবর্ষণ ও রিযিক পৌছানো ইত্যাদি কোন না কোন রহস্যের উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন উপকরণ ও শক্তিকে কাজে লাগানোও তেমনি। এর কোনটিই এজন্যে নয় যে, মানুষ এগুলোকে ক্ষমতাশালী স্বীকার করে তাদের কাছে সাহায্য চাইবে।

(২) ইমাম বায়যাভী বলেন ঃ পূর্ববর্তী শরীয়তসমূহে আদি কারণ হওয়ার দরুন আল্লাহ্‌কে 'পিতা' বলা হত। একেই মূর্খেরা জন্মদাতা অর্থে বুঝে নিয়েছে। ফলে এরূপ বিশ্বাস করা অথবা বলা কুফর সাব্যস্ত হয়েছে। অনিষ্টের ছিদ্রপথ বন্ধ করার লক্ষ্যে বর্তমানেও এ জাতীয় শব্দ ব্যবহারের অনুমতি নেই।

জ্ঞাতব্য ঃ ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা ছিল আসমানী কিতাবের অধিকারী। তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকও ছিল। তা সত্ত্বেও আল্লাহ্ তাআলা তাদের মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন। এর কারণ এই যে, প্রচুর অকাট্য ও শক্তিশালী নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করা সত্ত্বেও সেগুলো অস্বীকার মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তাদেরকে মূর্খ বলে অভিহিত করেছেন।

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصٰرٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ؕ
قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰى ؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ بَعْدَ
الَّذِىْ جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ ﴿١٢٠﴾
اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَتْلُوْنَهٗ حَقَّ تِلَاوَتِهٖ ؕ اُولٰٓئِكَ يُؤْمِنُوْنَ
بِهٖ ؕ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْخٰسِرُوْنَ ﴿١٢١﴾ يٰبَنِىْٓ اِسْرَآءِيْلَ
اذْكُرُوْا نِعْمَتِىَ الَّتِىْٓ اَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٢﴾
وَاتَّقُوْا يَوْمًا لَّا تَجْزِىْ نَفْسٌ عَنْ نَّفْسٍ شَيْـًٔا وَّلَا يُقْبَلُ مِنْهَا
عَدْلٌ وَّلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ﴿١٢٣﴾ وَاِذِ ابْتَلٰٓى
اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ فَاَتَمَّهُنَّ ؕ قَالَ اِنِّىْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا ؕ
قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِىْ ؕ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٢٤﴾ وَاِذْ جَعَلْنَا
الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَاَمْنًا ؕ وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ؕ وَعَهِدْنَآ
اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ اَنْ طَهِّرَا بَيْتِىَ لِلطَّآئِفِيْنَ وَالْعٰكِفِيْنَ وَالرُّكَّعِ
السُّجُوْدِ ﴿١٢٥﴾ وَاِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا وَّارْزُقْ
اَهْلَهٗ مِنَ الثَّمَرٰتِ مَنْ اٰمَنَ مِنْهُمْ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ؕ قَالَ وَمَنْ
كَفَرَ فَاُمَتِّعُهٗ قَلِيْلًا ثُمَّ اَضْطَرُّهٗٓ اِلٰى عَذَابِ النَّارِ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ ﴿١٢٦﴾

(১২০) ইহুদী ও খ্রীষ্টানরা কখনই আপনার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যে পর্যন্ত না আপনি তাদের ধর্মের অনুসরণ করেন। বলে দিন, যে পথ আল্লাহ্ প্রদর্শন করেন, তা ই হল সরল পথ। যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (১২১) আমি যাদেরকে গ্রন্থ দান করেছি, তারা তা যথাথভাবে পাঠ করে। তারাই তৎপ্রতি বিশ্বাস করে। আর যারা তা অবিশ্বাস করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (১২২) হে বনী-ইসরাঈল! আমার অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যা আমি তোমাদের দিয়েছি। আমি তোমাদেরকে বিশ্বাবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) তোমরা ভয় কর সেদিনকে, যে দিন এক ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তি বিন্দুমাত্র উপকৃত হবে না, কারও কাছ থেকে বিনিময় গৃহীত হবে না, কারও সুপারিশ ফলপ্রদ হবে না এবং তারা সাহায্যপ্রাপ্তও হবে না। (১২৪) যখন ইবরাহীমকে তাঁর পালনকর্তা কয়েকটি বিষয়ে পরীক্ষা করলেন, অতঃপর তিনি তা পূর্ণ করে দিলেন, তখন পালনকর্তা বললেন, আমি তোমাকে মানবজাতির নেতা করব। তিনি বললেন, আমার বংশধর থেকেও! তিনি বললেন, আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের পর্যন্ত পৌঁছাবে না। (১২৫) যখন আমি কা'বাগৃহকে মানুষের জন্যে সম্মিলন স্থল ও শান্তির আলয় করলাম, আর তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়ানোর জায়গাকে নামাযের জায়গা বানাও এবং আমি ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ করলাম, তোমরা আমার গৃহকে তওয়াফকারী, অবস্থানকারী ও রুকূ-সেজদাকারীদের জন্যে পবিত্র রাখ। (১২৬) যখন ইবরাহীম বললেন, পরওয়ারদেগার! এ স্থানকে তুমি শান্তিধাম কর এবং এর অধিবাসীদের মধ্যে যারা আল্লাহ্ ও কিয়ামতে বিশ্বাস করে, তাদেরকে ফলের দ্বারা রিযিক দান কর। বললেন ঃ যারা অবিশ্বাস করে, আমি তাদেরও কিছুদিন ফায়দা ভোগ করার সুযোগ দেবো, অতঃপর তাদেরকে বলপ্রয়োগে দোযখের আযাবে ঠেলে দেবো; সেটা নিকৃষ্ট বাসস্থান।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা কর্তৃক পয়গম্বর হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর বিভিন্ন পরীক্ষা, তাতে তাঁর সাফল্য এবং পুরস্কার ও প্রতিদানের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। হযরত খলীলুল্লাহ্ যখন স্নেহপরবশ হয়ে স্বীয় সন্তান-সন্ততির জন্যেও এ পুরস্কারের প্রার্থনা জানালেন, তখন পুরস্কার লাভের জন্যে একটি নিয়ম-নীতিও বলে দেয়া হল। এতে হযরত খলীলুল্লাহ্র প্রার্থনাকে শর্তসাপেক্ষে মঞ্জুর করে বলা হয়েছে যে, আপনার বংশধরগণও এই পুরস্কার পাবে, তবে তাদের মধ্যে যারা অবাধ্য ও যালেম হবে, তারা এ পুরস্কার পাবে না।

হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষাসমূহ ও পরীক্ষার বিষয়বস্তু ঃ এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

প্রথমতঃ যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশেই সাধারণতঃ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা সর্বজ্ঞ। কারও কোন অবস্থা অথবা গুণ-বৈশিষ্ট্যই তাঁর অজানা নয়। এমতাবস্থায় এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল?

দ্বিতীয়ত ঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে?

তৃতীয়তঃ কি ধরনের সাফল্য হয়েছে?

চতুর্থতঃ কি পুরস্কার দেয়া হল?

পঞ্চমতঃ পুরস্কারের জন্য নির্ধারিত নিয়ম-পদ্ধতির কিছু ব্যাখ্যা ও বিবরণ। এই পাঁচটি প্রশ্নের বিস্তারিত উত্তর লক্ষ্য করুন ঃ

প্রথমতঃ পরীক্ষার উদ্দেশ্য কি ছিল? কোরআনের একটি শব্দ ربّ (তাঁর পালনকর্তা) এ প্রশ্নের সমাধান করে দিয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে, এ পরীক্ষার পরীক্ষক স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। আর তাঁর 'আসমায়ে হুসনার' মধ্য থেকে এখানে 'রব' (পালনকর্তা) নামটি ব্যবহার করে রবুবিয়্যাতের (পালনকর্তৃত্বের) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর অর্থ কোন বস্তুকে ধীরে ধীরে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর এই পরীক্ষা কোন অপরাধের সাজা হিসেবে কিংবা অজ্ঞাত যোগ্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশে ছিল না; বরং এর উদ্দেশ্য ছিল পরীক্ষার মাধ্যমে স্বীয় বন্ধুর লালন করে তাঁকে পূর্ণত্বের স্তর পর্যন্ত পৌঁছানো। অতঃপর আয়াতে কর্মকে পূর্বে এবং কারককে পরে উল্লেখ করে ইবরাহীম (আঃ)-এর মহত্ত্বকে আরও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ কি কি বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছে? এ সম্পর্কে কোরআনে শুধু كلمات (বাক্যসমূহ) শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সাহাবী ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন উক্তি বর্ণিত আছে। কেউ খোদায়ী বিধানসমূহের মধ্য থেকে দশটি, কেউ ত্রিশটি এবং কেউ কমবেশী অন্য বিষয় উল্লেখ করেছেন। বাস্তব ক্ষেত্রে এতে কোন বিরোধ নেই, বরং সবগুলোই ছিল হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষার বিষয়বস্তু। প্রখ্যাত তফসীরকার ইবনে-জরীর ও ইবনে কাসীরের অভিমত তাই।

আল্লাহ্র কাছে সূক্ষ্মদর্শিতার চাইতে চারিত্রিক দৃঢ়তার মূল্য বেশী ঃ পরীক্ষার এসব বিষয়বস্তু পাঠশালায় অধীত জ্ঞান-অভিজ্ঞতার যাচাই কিংবা তৎসম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান ছিল না, বরং তা ছিল চারিত্রিক মূল্যবোধ এবং কর্মক্ষেত্রে দৃঢ়তা যাচাই করা। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্র দরবারে যে বিষয়ের মূল্য বেশী, তা শিক্ষাবিষয়ক সূক্ষ্মদর্শিতা নয়, বরং কার্যগত ও চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব।

এ ধরনের পরীক্ষার বিষয়বস্তুর মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই ঃ

আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা ছিল হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে স্বীয় বন্ধুত্বের বিশেষ মূল্যবান পোশাক উপহার দেয়া। তাই তাঁকে বিভিন্ন রকম কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। সমগ্র জাতি, এমন কি তাঁর আপন পরিবারের সবাই মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল। সবার বিশ্বাস ও রীতিনীতির বিপরীত একটি সনাতন ধর্ম তাঁকে দেয়া হয়। জাতিকে এ ধর্মের দিকে আহবান জানানোর গুরুদায়িত্ব তাঁর কাঁধে অর্পন করা হয়। তিনি পয়গম্বরসুলভ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার মাধ্যমে নির্ভয়ে জাতিকে এক আল্লাহ্র দিকে আহবান জানান। বিভিন্ন পন্থায় তিনি মূর্তি পূজার নিন্দা ও কুৎসা প্রচার করেন। প্রকৃতপক্ষে কার্যক্ষেত্রে তিনি মূর্তিসমূহের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। ফলে সমগ্র জাতি তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উদ্যত হয়। বাদশাহ্ নমরূদ ও তার পারিষদবর্গ তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার সিদ্ধান্ত নেয়। আল্লাহ্র খলীল প্রভুর সন্তুষ্টির জন্যে এসব বিপদাপদ সত্ত্বেও হাসিমুখে নিজেকে আগুনে নিক্ষেপের জন্যে পেশ করেন। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে দেখে আগুনকে নির্দেশ প্রদান করলেন ঃ

قُلْنَا يٰنَارُ كُوْنِىْ بَرْدًا وَّسَلٰمًا عَلٰٓى اِبْرٰهِيْمَ

অর্থাৎ, আমি হুকুম দিয়ে দিলাম ঃ হে অগ্নি, ইবরাহীমের উপর সুশীতল ও নিরাপত্তার কারণ হয়ে যাও।

নমরূদের আগুন সম্পর্কিত এ নির্দেশের মধ্যে ভাষা ছিল ব্যাপক। বস্তুতঃ কোন বিশেষ স্থানে আগুনকে নির্দিষ্ট করে এ নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ কারণে সমগ্র বিশ্বে যেখানেই আগুন ছিল, এ নির্দেশ আসা মাত্রই স্ব স্ব স্থানে সব ঠাণ্ডা হয়ে গেল। নমরূদের আগুন- এর আওতায় পড়ে শীতল হয়ে গেল।

কোরআনে بَرْدًا (শীতল) শব্দের সাথে سَلٰمًا (নিরাপদ) শব্দটি যুক্ত করার কারণ এই যে, কোন বস্তু সীমাতিরিক্ত শীতল হয়ে গেলে তাও বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়ক, বরং মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। سَلٰمًا বলা না হলে অগুন বরফের ন্যায় শীতল হয়ে কষ্টদায়কও হয়ে যেতে পারত।

এ পরীক্ষা সমাপ্ত হলে জন্মভূমি ত্যাগ করে সিরিয়ায় হিজরত করার পর দ্বিতীয় পরীক্ষা নেয়া হয়। ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের আশায় স্বগোত্র ও মাতৃভূমিকেও হাসিমুখে ত্যাগ করে পরিবার-পরিজনসহ সিরিয়ায় হিজরত করলেন।

মাতৃভূমি ও স্বজাতি ত্যাগ করে সিরিয়ায় অবস্থান শুরু করতেই নির্দেশ এল, বিবি হাজেরা (রাঃ) ও তাঁর দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত ইসমাঈল আলাইহিস সালামকে সঙ্গে নিয়ে এখান থেকেও স্থানান্তরে গমন করুন। — (ইবনে-কাসীর)

জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁদের সাথে নিয়ে রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে কোন শস্যশ্যামল বনানী আসলেই হযরত খলীল বলতেন, এখানে অবস্থান করানো হোক। জিবরাঈল (আঃ) বলতেন, এখানে অবস্থানের নির্দেশ নেই— গন্তব্যস্থল সামনে রয়েছে। চলতে চলতে যখন শুষ্ক পাহাড় ও উত্তপ্ত বালুকাময় প্রান্তর এসে গেল (যেখানে ভবিষ্যতে বায়তুল্লাহ্ নির্মাণ ও মক্কা নগরী আবাদ করা লক্ষ্য ছিল), তখন সেখানেই তাঁদের থামিয়ে দেয়া হল। আল্লাহ্র বন্ধু স্বীয় পালনকর্তার মহব্বতে মত্ত হয়ে এই জনশূন্য তৃণলতাহীন প্রান্তরেই বসবাস আরম্ভ করলেন। কিন্তু পরীক্ষার এখানেই শেষ হল না। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) নির্দেশ পেলেন যে, বিবি হাজেরা ও শিশুকে এখানে রেখে নিজে সিরিয়ায় ফিরে যাও। আল্লাহ্র বন্ধু নির্দেশ পাওয়া মাত্রই তা পালন করতে তৎপর হলেন এবং সিরিয়ার দিকে রওয়ানা হয়ে গেলেন। 'আল্লাহ্র নির্দেশ মোতাবেক আমি চলে যাচ্ছি'— বিবিকে এতটুকু কথা বলে যাওয়ার দেরীও তিনি সহ্য করতে পারলেন না। হযরত হাজেরা তাঁকে চলে যেতে দেখে কয়েকবার ডেকে অবশেষে কাতরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এ জন-মানবহীন প্রান্তরে আমাদের একা ফেলে রেখে কোথায় যাচ্ছেন? কিন্তু হযরত ইবরাহীম নির্বিকার— কোন উত্তর নেই। অবশ্য হাজেরাও ছিলেন খলিল্লাহ্রই সহধর্মিনী। ব্যাপার বুঝে ফেললেন। ডেকে বললেন, আপনি কি আল্লাহ্র কোন নির্দেশ পেয়েছেন? হযরত ইবরাহীম বললেন, হাঁ! খোদায়ী নির্দেশের কথা জানতে পেরে হযরত হাজেরা খুশীমনে বললেন,— যান। যে প্রভু আপনাকে চলে যেতে বলেছেন, তিনি আমাদের ধ্বংস হতে দেবেন না।

অতঃপর হযরত হাজেরা দুগ্ধপোষ্য শিশুকে নিয়ে জন-মানবহীন প্রান্তরে কালাতিপাত করতে থাকেন। এক সময় দারুণ পিপাসা তাঁকে পানির খোঁজে বের হতে বাধ্য করল। তিনি শিশুকে উম্মুক্ত প্রান্তরে রেখে 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়ে বার বার ওঠানামা করতে লাগলেন। কিন্তু কোথাও পানির চিহ্নমাত্র দেখলেন না এবং এমন কোন মানুষ দৃষ্টিগোচর হল না, যার কাছ থেকে কিছু তথ্য জানতে পারেন। সাত বার ছোটাছুটি করার পর তিনি নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন। এ ঘটনাকে স্মরণীয় করার উদ্দেশেই 'সাফা' ও 'মারওয়া' পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে সাত বার দৌড়ানো কেয়ামত পর্যন্ত ভবিষ্যৎ বংশধরদের জন্যে হজ্বের বিধি-বিধানে অত্যাবশ্যকীয় করা হয়েছে। হযরত হাজেরা যখন দৌড়াদৌড়ি শেষ করে নিরাশ হয়ে শিশুর কাছে ফিরে এলেন, তখন আল্লাহ্র রহমত নাযিল হল। জিবরাঈল (আঃ) আগমন করলেন এবং শুষ্ক মরুভূমিতে পানির একটি ঝর্ণাধারা বইয়ে দিলেন। বর্তমানে এ ধারার নামই যমযম। পানির সন্ধান পেয়ে প্রথমে জীব-জন্তু আগমন করল। জীব-জন্তু দেখে মানুষ এসে সেখানে আস্তানা গাড়ল। এভাবে মক্কায় জনপদের ভিত্তি রচিত হয়ে গেল। জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় কিছু আসবাবপত্রও সংগৃহীত হল।

হযরত ইসমাঈল (আঃ) নামে খ্যাত এই সদ্যজাত শিশু লালিত-পালিত হয়ে কাজ-কর্মের উপযুক্ত হয়ে গেলেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র ইঙ্গিতে মাঝে মাঝে এসে বিবি হাজেরা ও শিশুকে দেখে যেতেন। এ সময় আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় বন্ধুর তৃতীয় পরীক্ষা নিতে চাইলেন। বালক ইসমাঈল অসহায় ও দীন-হীন অবস্থায় বড় হয়েছিলেন এবং পিতার স্নেহ-বাৎসল্য থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এমতাবস্থায় পিতা খোলাখোলি নির্দেশ পেলেন ঃ এ ছেলেকে নিজ হাতে জবাই করে দাও। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ —'বালক যখন পিতার কাজে কিছু সাহায্য করার যোগ্য হয়ে উঠল, তখন ইবরাহীম (আঃ) তাকে বললেন ঃ হে বৎস, আমি স্বপ্নে তোমাকে জবাই করতে দেখেছি। এখন বল, তোমার কি অভিপ্রায়? পিতৃভক্ত বালক আরয করলেন ঃ' পিতঃ, আপনি যে আদেশ পেয়েছেন, তা পালন করুন। আপনি আমাকেও ইনশাআল্লাহ্ এ ব্যাপারে ধৈর্যশীল পাবেন।'

এর পরবর্তী ঘটনা সবাই জ্ঞাত আছেন যে, হযরত খলীল (আঃ) পুত্রকে জবাই করার উদ্দেশে মিনা প্রান্তরে নিয়ে গেলেন। অতঃপর আল্লাহ্র আদেশ পালনে নিজের পক্ষ থেকে যা করণীয় ছিল, তা পুরোপুরিই সম্পন্ন করলেন। কিন্তু প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে উদ্দেশ্য

পুত্রকে জবাই করানো ছিল না, বরং পুত্রবৎসল পিতার পরীক্ষা নেয়া উদ্দেশ্য ছিল। স্বপ্নের ভাষা সম্পর্কে চিন্তা করলে দেখা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) স্বপ্নে 'জবাই করে দিয়েছেন' দেখেন নি, বরং জবাই করছেন অর্থাৎ, জবাই করার কাজটি দেখেছেন। অতঃপর হযরত ইবরাহীম (আঃ) তা'ই বাস্তবে পরিণত করেছিলেন। প্রত্যক্ষ করার মাধ্যমে কাজটি দেখানো হয়েছে। এ কারণেই صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا বলা হয়েছে যে, স্বপ্নে যা দেখেছিলেন আপনি তা পূর্ণ করে দিয়েছেন। হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলা বেহেশত থেকে এর পরিপূরক নাযিল করে তা কোরবানী করার আদেশ দিলেন। এ রীতিটিই পরে ভবিষ্যতের জন্য একটি চিরন্তন রীতিতে পরিণতি লাভ করে।

এগুলো ছিল বড়ই কঠিন পরীক্ষা, যার সম্মুখীন হযরত খলীলুল্লাহ্কে করা হয়। এর সাথে সাথেই আরও অনেকগুলো কাজ এবং বিধি-বিধানের বাধ্যবাধকতাও তাঁর উপর আরোপ করা হল। তন্মধ্যে দশটি কাজ 'খাসায়েলে ফিতরত' (প্রকৃতিসুলভ অনুষ্ঠান) নামে অভিহিত। এগুলো হলো শারীরিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত ভবিষ্যত উম্মতের জন্যেও এগুলো স্থায়ী বিধি-বিধানে পরিণত হয়েছে। সর্বশেষ পয়গম্বর হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-ও তাঁর উম্মতকে এসব বিধি-বিধান পালনের জোর তাকিদ দিয়েছেন।

ইবনে-কাসীর হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত করেছেন। এতে বলা হয়েছে ঃ সমস্ত ইসলাম ত্রিশটি অংশে সীমাবদ্ধ। তন্মধ্যে দশটি সূরা বারাআতে, দশটি সূরা আহ্যাবে এবং দশটি সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) এগুলো পূর্ণরূপে পালন করেছেন এবং সব পরীক্ষায়ই উত্তীর্ণ হয়েছেন।

সূরা বারাআতে মু'মিনদের গুণাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমানের দশটি বিশেষ লক্ষণ ও গুণ এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

—"তারা হলেন তওবাকারী, এবাদতকারী, প্রশংসাকারী, রোযাদার, রুকূ-সেজদাকারী, সৎকাজের আদেশকারী, অসৎকাজে বাধা-দানকারী, আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার হেফাযতকারী— এহেন ঈমানদারদের সুসংবাদ শুনিয়ে দিন।"

সূরা মু'মিনূনে বর্ণিত দশটি গুণ হল এই ঃ

"নিশ্চিতরূপেই ঐসব মুসলমান কৃতকার্য, যারা নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে, যারা অনর্থক বিষয় থেকে দূরে সরে থাকে, যারা নিয়মিত যাকাত প্রদান করে, যারা স্বীয় লজ্জাস্থানের রক্ষণাবেক্ষণ করে, কিন্তু আপন স্ত্রী ও যাদের উপর বিধিসম্মত অধিকার রয়েছে তাদের ব্যতীত। কারণ, এ ব্যাপারে তাদের অভিযুক্ত করা হবে না। যারা এদের ছাড়া অন্যকে তালাশ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী। যারা স্বীয় আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি লক্ষ্য রাখে, যারা নিয়মানুবর্তিতার সাথে নামায পড়ে, এমন লোকেরাই উত্তরাধিকারী হবে। তারা হবে জান্নতুল ফেরদাউসের উত্তরাধিকারী। সেখানে তারা অনন্তকাল বাস করবে।"

সূরা আহ্যাবে বর্ণিত দশটি গুণ হল ঃ

– "নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও মুসলিম নারী, ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী, আনুগত্যশীল পুরুষ ও আনুগত্যশীলা নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও সত্যবাদিনী নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও ধৈর্যশীলা নারী, বিনয় অবলম্বনকারী পুরুষ ও বিনয় অবলম্বনকারিনী নারী, খয়রাতকারী পুরুষ ও খয়রাতকারিনী নারী, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার নারী, লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারী পুরুষ ও লজ্জাস্থানের রক্ষণা-বেক্ষণকারিনী নারী, অধিক পরিমাণে আল্লাহ্র যিকরকারী পুরুষ ও যিকরকারিনী নারী— তাদের সবার জন্যে আল্লাহ্ তাআলা মাগফেরাত ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।"

কোরআনের মুফাস্সির হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাসের উপরোদ্ধৃত উক্তির দ্বারা বোঝা গেল যে, মুসলমানদের জন্যে যেসব জ্ঞান এবং কর্মগত ও নৈতিক গুণ অর্জন করা দরকার, তার সবই এ তিনটি সূরার কয়েকটি আয়াতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এগুলোই কোরআনোক্ত كلمات যেসব বিষয়ে হযরত খলীলুল্লাহ্র পরীক্ষা নেয়া হয়েছে। وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ بِكَلِمٰتٍ আয়াতের ইঙ্গিতও এসব বিষয়ের দিকেই।

এ পর্যন্ত আয়াত সম্পর্কিত পাঁচটি প্রশ্নের মধ্যে দু'টির উত্তর সম্পন্ন হল।

তৃতীয় প্রশ্ন ছিল এ পরীক্ষায় হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সাফল্যের প্রকার ও শ্রেণী সম্পর্কে। এর উত্তর এই যে, স্বয়ং কোরআনই বিশেষ ভঙ্গিতে তাঁকে সাফল্যের স্বীকৃতি ও সনদ প্রদান করেছে ঃ وَاِبْرٰهِيْمَ الَّذِيْ وَفّٰٓى আর ইবরাহীম পরীক্ষায় পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে। অর্থাৎ, প্রতিটি পরীক্ষায় সম্পূর্ণ ও একশ' ভাগ সাফল্যের ঘোষণা আল্লাহ্ দিয়েছেন।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, এই পরীক্ষার পুরস্কার কি পেলেন? এরও বর্ণনা এই আয়াতেই রয়েছে— বলা হয়েছে ঃ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا – পরীক্ষার পর আল্লাহ্ বলেন— "আমি তোমাকে মানব সমাজের নেতৃত্বদান করব।"

এ আয়াত দ্বারা একদিকে বোঝা গেল যে, হযরত খলীল (আঃ)-কে সাফল্যের প্রতিদানে মানবসমাজের নেতৃত্ব দেয়া হয়েছে, অপরদিকে মানবসমাজের নেতা হওয়ার জন্যে যে পরীক্ষা দরকার, তা পার্থিব পাঠশালা বা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার অনুরূপ নয়। পার্থিব পাঠশালাসমূহের পরীক্ষায় কতিপয় বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান ও চুলচেরা বিশ্লেষণকেই সাফল্যের মাপকাঠি বিবেচনা করা হয়। কিন্তু নেতৃত্ব লাভের পরীক্ষায় আয়াতে বর্ণিত ত্রিশটি নৈতিক ও কর্মগত গুণে পুরোপুরি গুণান্বিত হওয়া শর্ত। কোরআনের অন্য এক জায়গায় এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে ঃ

— "যখন তারা শরীয়তবিরুদ্ধ কাজে সংযমী হল এবং আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাসী হল, তখন আমি তাদেরকে নেতা করে দিলাম, যাতে আমার নির্দেশ অনুযায়ী মানুষকে পথ প্রদর্শন করে।"

এই আয়াতে صبر (সংযম) ও يقين (বিশ্বাস) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পূর্বোক্ত ত্রিশটি গুণ সন্নিবেশিত করে দেয়া হয়েছে। صبر হল শিক্ষাগত ও বিশ্বাসগত পূর্ণতা আর يقين কর্মগত ও নৈতিক পূর্ণতা।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল এই যে, পাপাচারী ও যালেমকে নেতৃত্বলাভের সম্মান দেয়া হবে না বলে ভবিষ্যত বংশধরদের নেতৃত্বলাভের জন্যে যে বিধান ব্যক্ত হয়েছে, তার অর্থ কি?

এর ব্যাখ্যা এই যে, নেতৃত্ব এক দিক দিয়ে আল্লাহ্ তাআলার খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্ব। আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে এ পদ দেয়া যায় না। এ কারণেই আল্লাহ্র অবাধ্য ও বিদ্রোহীকে স্বেচ্ছায় নেতা বা প্রতিনিধি নিযুক্ত না করা মুসলমানদের অবশ্য কর্তব্য।

হযরত খলীলুল্লাহ্‌র মক্কায় হিজরত ও কা'বা নির্মাণের ঘটনা ঃ এই আয়াতে কা'বা গৃহের ইতিহাস, হযরত ইবরাহীম ও হযরত ইসমাঈল (আঃ) কর্তৃক কা'বা গৃহের পুনঃনির্মাণ, কা'বা ও মক্কার কতিপয় বৈশিষ্ট্য এবং কা'বা গৃহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন সম্পর্কিত বিধি-বিধান উল্লেখিত হয়েছে। এ বিষয়টি কোরআনের অনেক সূরায় ছড়িয়ে রয়েছে।

হরম সম্পর্কিত মাসায়েল

(১) مَثَابَةً শব্দ থেকে বোঝা যায় যে, আল্লাহ্ তাআলা কা'বা গৃহকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। ফলে তা সর্বদাই মানবজাতির প্রত্যাবর্তনস্থল হয়ে থাকবে এবং মানুষ বরাবর তার দিকে ফিরে যেতে আকাঙ্খী হবে। মুফাসসির শ্রেষ্ঠ হযরত মুজাহিদ বলেন ঃ لايقضى احد منها وطرا অর্থাৎ, কোন মানুষ কা'বা গৃহের যেয়ারত করে তৃপ্ত হয় না, বরং প্রতি বারই যেয়ারতের অধিকতর বাসনা নিয়ে ফিরে আসে। কোন কোন আলেমের মতে কা'বা গৃহ থেকে ফিরে আসার পর আবার সেখানে যাওয়ার আগ্রহ হজ্ব কবুল হওয়ার অন্যতম লক্ষণ। সাধারণভাবে দেখা যায়, প্রথমবার কা'বাগৃহ যেয়ারত করার যতটুকু আগ্রহ থাকে, দ্বিতীয়বার তা আরও বৃদ্ধি পায় এবং যতবারই যেয়ারত করতে থাকে, এ আগ্রহ উত্তরোত্তর ততই বেড়ে যেতে থাকে।

এবিস্ময়কর ব্যাপারটি একমাত্র কা'বারই বৈশিষ্ট্য । নতুন জগতের শ্রেষ্ঠতম মনোরম দৃশ্যও এক-দু'বার দেখেই মানুষ পরিতৃপ্ত হয়ে যায়। পাঁচ-সাতবার দেখলে আর দেখার ইচ্ছাই থাকে না। অথচ এখানে না আছে কোন মনোমুগ্ধকর দৃশ্যপট, না এখানে পৌছা সহজ এবং না আছে ব্যবসায়িক সুবিধা, তা সত্ত্বেও এখানে পৌছার আকুল আগ্রহ মানুষের মনে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। হাজার হাজার টাকা ব্যয় করে অপরিসীম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌছার জন্যে মানুষ ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে।

(২) এখানে اَمْنًا শব্দের অর্থ مأمن অর্থাৎ, শান্তির আবাসস্থল بيت শব্দের অর্থ শুধু কা'বা গৃহ নয়, বরং সম্পূর্ণ হরম। অর্থাৎ, কা'বা গৃহের পবিত্র প্রাঙ্গণ। কোরআনে بيت الله ও كعبة শব্দ বলে যে সম্পূর্ণ হরমকে বোঝানো হয়েছে, তার আরও বহু প্রমাণ রয়েছে। যেমন, এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ هَدْيًا بٰلِغَ الْكَعْبَةِ এখানে كعبة বলে সমগ্র হরমকে বোঝানো হয়েছে। কারণ, এতে কোরবানীর কথা আছে। কোরবানী কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে হয় না এবং সেখানে কোরবানী করা বৈধও নয়। কাজেই আয়াতের অর্থ হবে যে, 'আমি কা'বার হরমকে শান্তির আলয় করেছি।' শান্তির আলয় করার অর্থ মানুষকে নির্দেশ দেয়া যে, এ স্থানকে সাধারণ হত্যা ও যুদ্ধ-বিগ্রহ ইত্যাদি অশান্তিজনিত কার্যকলাপ থেকে মুক্ত রাখতে হবে।— (ইবনে-আরাবী)।

(৩) وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى এখানে মকামে-ইবরাহীমের অর্থ ঐ পাথর, যাতে মু'জেযা হিসাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন অঙ্কিত হয়ে গিয়েছিল। কা'বা নির্মাণের সময় এ পাথরটি তিনি ব্যবহার করেছিলেন।— (সহীহ্ বুখারী)

হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, আমি এই পাথরে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর পদচিহ্ন দেখেছি। যেয়ারতকারীদের উপর্যুপরি স্পর্শের দরুন চিহ্নটি এখন অস্পষ্ট হয়ে পড়েছে।— (কুরতুবী)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে মকামে-ইবরাহীমের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বর্ণিত রয়েছে যে, সমগ্র হরমটিই মকামে-ইবরাহীম। এর অর্থ বোধ হয় এই যে, তওয়াফের পর যে দু'রাকআত নামায মকামে-ইবরাহীমে পড়ার নির্দেশ আলোচ্য আয়াতে রয়েছে, তা হরমের যে কোন অংশে পড়লেই চলে। অধিকাংশ ফিকাহ্ শাস্ত্রবিদ এ ব্যাপারে একমত।

(৪) আলোচ্য আয়াতে মকামে-ইবরাহীমকে নামাযের জায়গা করে নিতে বলা হয়েছে। স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বিদায় হজ্বের সময় কথা ও কর্মের মাধ্যমে এর ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন। তিনি তওয়াফের পর কা'বা গৃহের সম্মুখে অনতিদূরে রক্ষিত মকামে-ইবরাহীমের কাছে আগমন করলেন এবং এ আয়াতটি পাঠ করলেন وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى অতঃপর মকামে-ইবরাহীমের পেছনে এমনভাবে দাঁড়িয়ে দু'রাকআত নামায পড়লেন যে, কা'বা ছিল তাঁর সম্মুখে এবং কা'বা ও তাঁর মাঝখানে ছিল মকামে-ইবরাহীম।— (সহীহ্ মুসলিম)

এ কারণেই ফিকাহ্‌শাস্ত্রবিদগণ বলেছেন ঃ যদি কেউ মকামে-ইবরাহীমের পেছনে সংলগ্ন স্থানে জায়গা না পায়, তবে মকামে-ইবরাহীম ও কা'বা উভয়টিকে সামনে রেখে যে কোন দূরত্বে দাঁড়িয়ে নামায পড়লে নির্দেশ পালিত হবে।

(৫) আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তওয়াফ পরবর্তী দুই রাকআত নামায ওয়াজিব।— (জাস্‌সাস, মোল্লা আলী ক্বারী)

তবে এ দু'রাকআত নামায বিশেষভাবে মকামে-ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। হরমের অন্যত্র পড়লেও আদায় হবে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) এ দু'রাকআত নামায কা'বা গৃহের দরজা সংলগ্ন স্থানে পড়েছেন বলেও প্রমাণিত রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) ও তাই করেছেন বলে বর্ণিত আছে (জাস্‌সাস)। মোল্লা আলী ক্বারী মানাসেক গ্রন্থে বলেছেন, এ দু'রাকআত মকামে ইবরাহীমের পেছনে পড়া সুন্নত। যদি কোন কারণে সেখানে পড়তে কেউ অক্ষম হয়, তবে হরম অথবা হরমের বাইরে যে কোনখানে পড়ে নিলে ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।

(৬) وَطَهِّرْ بَيْتِىَ এখানে কা'বা গৃহকে পাক-সাফ করার নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। বাহ্যিক অপবিত্রতা ও আবর্জনা এবং আত্মিক অপবিত্রতা উভয়টিই এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন, কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, লালসা, কুপ্রবৃত্তি, অহঙ্কার, রিয়া, নাম-যশ ইত্যাদির কলুষ থেকেও কা'বা গৃহকে পবিত্র রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ নির্দেশে بيتى শব্দ দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ আদেশ যে কোন মসজিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কারণ, সব মসজিদই আল্লাহ্‌র ঘর। কোরআনে বলা হয়েছে ঃ

فِىْ بُيُوْتٍ اَذِنَ اللّٰهُ اَنْ تُرْفَعَ

হযরত ফারুকে আ'যম (রাঃ) মসজিদে এক ব্যক্তিকে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলতে শুনে বললেন ঃ তুমি কোথায় দাঁড়িয়ে আছ, জান না? (কুরতুবী) অর্থাৎ, মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত, এতে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা উচিত নয়। মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে কা'বা গৃহকে যেমন যাবতীয় বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে মুক্ত রাখতে বলা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য মসজিদকেও পাক-পবিত্র রাখতে হবে। দেহ ও পোশাক-পরিচ্ছদকে যাবতীয় অপবিত্রতা ও দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু থেকে পাক-সাফ করে এবং অন্তরকে কুফর, শিরক, দুশ্চরিত্রতা, অহঙ্কার, হিংসা, লোভ-লালসা ইত্যাদি থেকে পবিত্র করে মসজিদে প্রবেশ করা কর্তব্য। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) পেঁয়াজ, রসুন ইত্যাদি দুর্গন্ধযুক্ত বস্তু খেয়ে মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। তিনি ছোট শিশু এবং

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرٰهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمٰعِيلُ ۚ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٢٧﴾ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَ
مِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ۖ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا ۚ
إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١٢٨﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا
مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَ
يُزَكِّيهِمْ ۚ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٢٩﴾ وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ
إِبْرٰهِمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ ۚ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنٰهُ فِي الدُّنْيَا ۚ
وَإِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِينَ ﴿١٣٠﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ ۙ
قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿١٣١﴾ وَوَصّٰى بِهَا إِبْرٰهِمُ بَنِيهِ وَ
يَعْقُوبُ ۚ يٰبَنِيَّ إِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا
وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٢﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ
الْمَوْتُ ۙ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي ۖ قَالُوا نَعْبُدُ
إِلٰهَكَ وَإِلٰهَ اٰبَائِكَ إِبْرٰهِمَ وَإِسْمٰعِيلَ وَإِسْحٰقَ إِلٰهًا وَاحِدًا ۚ
وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٣﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ
وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ ۖ وَلَا تُسْـَٔلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٣٤﴾

(১২৭) স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম ও ইসমাঈল কা'বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিল ঃ পরওয়ারদেগার ! আমাদের থেকে কবুল কর। নিশ্চয়ই, তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ। (১২৮) পরওয়ারদেগার ! আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি কর, আমাদের হজ্জের রীতিনীতি বলে দাও এবং আমাদের ক্ষমা কর। নিশ্চয় তুমি তওবা কবুলকারী, দয়ালু। (১২৯) হে পরওয়ারদেগার। তাদের মধ্য থেকেই তাদের নিকট একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন— যিনি তাদের কাছে তোমার আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হেকমত শিক্ষা দেবেন এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয় তুমিই পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (১৩০) ইবরাহীমের ধর্ম থেকে কে মুখ ফেরায়? কিন্তু সে ব্যক্তি, যে নিজেকে বোকা পতিপন্ন করে। নিশ্চয়ই আমি তাকে পৃথিবীতে মনোনীত করেছি এবং সে পরকালে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত। (১৩১) স্মরণ কর, যখন তাকে তার পালনকর্তা বললেন ঃ অনুগত হও। সে বলল ঃ আমি বিশ্বপালকের অনুগত হলাম। (১৩২) এরই ওছিয়ত করেছে ইবরাহীম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও যে, হে আমার সন্তানগণ, নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের জন্যে এ ধর্মকে মনোনীত করেছেন। কাজেই তোমরা মুসলমান না হয়ে কখনও মৃত্যুবরণ করো না। (১৩৩) তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বলল ঃ আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার, পিতৃ-পুরুষ ইবরাহীম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (১৩৪) আমরা সবাই তাঁর আজ্ঞাবহ। তারা ছিল এক সম্প্রদায়— যারা গত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদেরই জন্যে। তারা কি করত, সে সম্পর্কে তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে না।

পাগলদেরও মসজিদে প্রবেশ করতে বারণ করেছেন। কারণ, তাদের দ্বারা মসজিদ অপবিত্র হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

(৭) لِلطَّآئِفِينَ وَالْعٰكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ আয়াতের শব্দগুলো থেকে কতিপয় বিধি-বিধান প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ কা'বা গৃহ নির্মাণের উদ্দেশ্য তওয়াফ, এ'তেকাফ ও নামায। দ্বিতীয়তঃ তওয়াফ আগে আর নামায পরে। (হযরত ইবনে আব্বাসের অভিমত তাই)। তৃতীয়তঃ, বিশ্বের বিভিন্ন কোণ থেকে আগমনকারী হাজীদের পক্ষে নামাযের চাইতে তওয়াফ উত্তম। চতুর্থতঃ ফরয হোক অথবা নফল কা'বা গৃহের অভ্যন্তরে যে কোন নামায পড়া বৈধ। — (জাস্‌সাস)

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ) আল্লাহ্র পথে অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন। অর্থ-সম্পদ, পরিবার-পরিজন এবং কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আল্লাহ্র আদেশ পালনে তৎপর হওয়ার যেসব অক্ষয় কীর্তি তিনি স্থাপন করেছেন, তা নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর ও নজীরবিহীন।

সন্তানের প্রতি স্নেহ ও মমতা শুধু একটি স্বাভাবিক ও সহজাত বৃত্তিই নয়; বরং এ ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলারও নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখিত আয়াতসমূহ এর প্রমাণ। তিনি সন্তানদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া ঃ رب শব্দ দ্বারা দোয়া আরম্ভ করেছেন। এর অর্থ, 'হে আমার পালনকর্তা।' তিনি এই শব্দের মাধ্যমে দোয়া করার রীতি শিক্ষা দিয়েছেন। কারণ, এ জাতীয় শব্দ আল্লাহ্র রহমত ও কৃপা আকৃষ্ট করার ব্যাপারে খুবই কার্যকর ও সহায়ক। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর প্রথম দোয়া এই ঃ "তোমার নির্দেশে আমি এই জনমানবহীন প্রান্তরে নিজ পরিবার-পরিজনকে রেখে যাচ্ছি। তুমি একে একটি শান্তিপূর্ণ শহর বানিয়ে দাও— যাতে এখানে বসবাস করা আতঙ্কজনক না হয় এবং জীবনধারণের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সহজলভ্য হয়।"

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বিতীয় দোয়ায় বলা হয়েছে ঃ পরয়ারদেগার ! শহরটিকে শান্তিধাম করে দাও। অর্থাৎ, হত্যা, লুণ্ঠন, কাফেরদের অধিকার স্থাপন, বিপদাপদ থেকে সুরক্ষিত ও নিরাপদ রাখ।

হযরত ইবরাহীমের এই দোয়া কবুল হয়েছে। মক্কা মুকাররমা শুধু একটি জনবহুল নগরীই নয়, সারা বিশ্বের প্রত্যাবর্তনস্থলও বটে। বিশ্বের চার দিক থেকে মুসলমানগণ এ নগরীতে পৌঁছাকে সর্ববৃহৎ সৌভাগ্য মনে করে। নিরাপদ ও সুরক্ষিতও এতটুকু হয়েছে যে, আজ পর্যন্ত কোন শত্রুজাতি অথবা শত্রুসম্রাট এর উপর অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি। 'আসহাবে-ফীলের' ঘটনা স্বয়ং কোরআনে উল্লেখিত রয়েছে। তারা কা'বা ঘরের উপর আক্রমণের ইচ্ছা করতেই সমগ্র বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছিল।

এ শহরটি হত্যা ও লুটতরাজ থেকেও সর্বদা নিরাপদ রয়েছে। জাহেলিয়াত যুগে আরবরা অগণিত আনাচার, কুফর ও শিরকে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও কা'বা ঘর ও তার পার্শ্ববর্তী হরমের প্রতি সম্মান প্রদর্শনকে ধর্মীয় কর্তব্য বলে মনে করত। তারা প্রাণের শত্রুকে হাতে পেয়েও হরমের মধ্যে পাল্টা হত্যা অথবা প্রতিশোধ গ্রহণ করত না। এমনকি, হরমের অধিবাসীদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের রীতি সমগ্র আরবে প্রচলিত ছিল। এ

কারণেই মক্কাবাসীরা বাণিজ্যব্যাপদেশে নির্বিঘ্নে সিরিয়া ও ইয়ামানে যাতায়াত করত। কেউ তাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করত না।

আল্লাহ্ তাআলা হরমের চতুঃসীমায় জীব-জন্তুকেও নিরাপত্তা দান করেছেন। এই এলাকায় শিকার করা জায়েয নয়। জীব-জন্তুর মধ্যেও স্বাভাবিক নিরাপত্তাবোধ জাগ্রত করে দেয়া হয়েছে। ফলে তারা সেখানে শিকারী দেখলেও ভয় পায় না।

হযরত ইবরাহীমের তৃতীয় দোয়া এই যে, এ শহরের অধিবাসীদের উপজীবিকা হিসাবে যেন ফল-মূল দান করা হয়। মক্কা-মুকাররমা ও পার্শ্ববর্তী ভূমি কোনরূপ বাগ-বাগিচার উপযোগী ছিল না। দূর-দূরান্ত পর্যন্ত ছিল না পানির নাম-নিশানা। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা ইবরাহীমের দোয়া কবুল করে নিয়ে মক্কার অদূরে 'তায়েফ' নামক একটি ভূখণ্ড সৃষ্টি করে দিলেন। তায়েফে যাবতীয় ফলমূল প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় যা মক্কার বাজারেই বেচা-কেনা হয়।

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর সাবধানতা ঃ আলোচ্য আয়াতে মু'মিন ও কাফের নির্বিশেষে সমগ্র মক্কাবাসীর জন্যে শান্তি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দোয়া করা হয়েছে। ইতিপূর্বে এক দোয়ায় যখন হযরত খলীল স্বীয় বংশধরের মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, মু'মিনদের পক্ষে এ দোয়া কবুল হলো, জালেম ও মুশরিকদের জন্য নয়। সে দোয়াটি ছিল নেতৃত্ব লাভের দোয়া। হযরত খলীল (আঃ) ছিলেন আল্লাহ্র বন্ধুত্বের মহান মর্যাদায় উন্নীত ও খোদাভীতির প্রতীক। তাই এ ক্ষেত্রে সে কথাটি মনে পড়ে গেল এবং তিনি দোয়ার শর্ত যোগ করলেন যে, আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির এ দোয়া শুধু মুমিনদের জন্য করেছি। আল্লাহ্র পক্ষ থেকে এ ভয় ও সাবধানতার মূল্য দিয়ে বলা হয়েছে ঃ وَمَنْ كَفَرَ অর্থাৎ, পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য আমি সমস্ত মক্কাবাসীকেই দান করব, যদিও তারা কাফের, মুশরিক হয়। তবে মু'মিনদেরকে ইহকাল ও পরকাল সর্বত্রই তা দান করব, কিন্তু কাফেররা পরকালে শাস্তি ছাড়া আর কিছুই পাবে না।

স্বীয় সৎকর্মের উপর ভরসা না করা ও তুষ্ট না হওয়ার শিক্ষাঃ হযরত ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র নির্দেশে সিরিয়ার সুজলা-সুফলা সুদর্শন ভূখণ্ড ছেড়ে মক্কার বিশুষ্ক পাহাড়সমূহের মাঝখানে স্বীয় পরিবার-পরিজনকে এনে রাখেন এবং কা'বা গৃহের নির্মাণে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। এরূপ ক্ষেত্রে অন্য কোন আত্মত্যাগী সাধকের অন্তরে অহংকার দানা বাঁধতে পারত এবং সে তাঁর ক্রিয়াকর্মকে অনেক মূল্যবান মনে করতে পারত। কিন্তু এখানে ছিলেন আল্লাহ্র এমন এক বন্ধু যিনি আল্লাহ্র প্রতাপ ও মহিমা সম্পর্কে যথার্থভাবে অবহিত। তিনি জানতেন, আল্লাহ্র উপযুক্ত এবাদত ও আনুগত্য কোন মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি সামর্থ্য অনুযায়ী কাজ করে। তাই আমল যত বড়ই হোক সেজন্য অহংকার না করে কেঁদে কেঁদে এমনি দোয়া করা প্রয়োজন যে, হে পরওয়ারদেগার ! আমার এ আমল কবুল হোক। কা'বা গৃহ নির্মাণের আমল প্রসঙ্গে হযরত ইবরাহীম তাই বলেছেন, رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا হে পরওয়ারদেরগার ! আমাদের এ আমল কবুল করুন। কেননা, আপনি শ্রোতা, আপনি সর্বজ্ঞ।

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ — এ দোয়াটিও হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান ও খোদাভীতিরই ফল, আনুগত্যের অদ্বিতীয় কীর্তি স্থাপন করার পরও তিনি এরূপ দোয়া করেন যে, আমাদের উভয়কে তোমার আজ্ঞাবহ কর। কারণ, মা'রেফাত তথা আল্লাহ্ সম্পর্কিত জ্ঞান যার যত বৃদ্ধি পেতে থাকে সে ততবেশী অনুভব করতে থাকে যে, যথার্থ আনুগত্য তার দ্বারা সম্ভব হচ্ছে না।

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا —এ দোয়াতেও স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহ্র প্রেমিক, আল্লাহ্র পথে নিজের সন্তান-সন্ততিকে বিসর্জন দিতেও এতটুকু কুণ্ঠিত নন। তিনিও সন্তানদের প্রতি কতটুকু মহব্বত ও ভালবাসা রাখেন। কিন্তু এই ভালবাসার দাবীসমূহ কয়জন পূর্ণ করতে পারে ? সাধারণ লোক সন্তানদের শুধু শারীরিক সুস্থতা ও আরামের দিকেই খেয়াল রাখে। তাদের যাবতীয় স্নেহ-মমতা এ দিকটিকে কেন্দ্র করেই। কিন্তু আল্লাহ্র প্রিয় বান্দারা শারীরিকের চাইতে আত্মিক এবং জাগতিকের চাইতে পারলৌকিক আরামের জন্যে চিন্তা করেন অধিক। এ কারণেই হযরত ইবরাহীম (আঃ) দোয়া করলেন ঃ "আমাদের সন্তানদের মধ্য থেকে একটি দলকে পূর্ণ আনুগত্যশীল কর।" সন্তানদের জন্যে এ দোয়ার মধ্যে আরও একটি তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। অভিজ্ঞতা সাক্ষ্য দেয় যে, সমাজে যারা গণ্য মান্য, তাদের সন্তানরা পিতার পথ অনুসরণ করলে সমাজে তাদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। তাদের যোগ্যতা জনগণের যোগ্যতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।—(বাহ্রে-মুহীত)

হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর এ দোয়াটিও কবুল হয়েছে। তাঁর বংশধরের মধ্যে কখনও সত্যধর্মের অনুসারী ও আল্লাহ্র আজ্ঞাবহ আদর্শ পুরুষের অভাব হয়নি। জাহেলিয়াত আমলে আরবে যখন সর্বত্র মূর্তিপূজার জয়-জয়কার, তখনও ইবরাহীমের বংশধরের মধ্যে কিছু লোক একত্ববাদ ও পরকালে বিশ্বাসী এবং আল্লাহ্র আনুগত্যশীল ছিলেন। যেমন যায়েদ ইবনে আমর, ইবনে নওফেল এবং কুস ইবনে সায়েদা প্রমুখ। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিব ইবনে হাশেম সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, মূর্তিপূজার প্রতি তাঁরও অশ্রদ্ধা ছিল।—(বাহ্রে-মুহীত)

يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِكَ — তেলাওয়াতের আসল অর্থ অনুসরণ করা। কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি কোরআন ও অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কারণ, যে লোক এসব কালাম পাঠ করে, এর অনুসরণ করাও তার অবশ্য কর্তব্য। আসমানী গ্রন্থ ঠিক যেভাবে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়, হুবহু তেমনিভাবে পাঠ করা জরুরী। নিজের পক্ষ থেকে তাতে কোন শব্দ অথবা স্বরচিহ্নটিও পরিবর্তন পরিবর্ধন করার অনুমতি নেই। ইমাম রাগেব ইস্পাহানী 'মুফরাদাতুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেনঃ "আল্লাহ্র কালাম ছাড়া অন্য কোন গ্রন্থ অথবা কালাম পাঠ করাকে সাধারণ পরিভাষায় তেলাওয়াত বলা যায় না।"

وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ — এখানে কিতাব বলে আল্লাহ্র কিতাব বোঝানো হয়েছে। 'হেকমত' শব্দটি আরবী অভিধানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যথা— সত্যে উপনীত হওয়া, ন্যায় ও সুবিচার, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ইত্যাদি।— (কামুস)

ইমাম রাগেব ইস্পাহানী লেখেন ঃ এ শব্দটি আল্লাহ্র জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় সকল বস্তুর পূর্ণজ্ঞান এবং সুদৃঢ় উদ্ভাবন। অন্যের জন্যে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয়, বিদ্যমান বস্তুসমূহের বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং সৎকর্ম। বিশুদ্ধ জ্ঞান, সৎকর্ম, ন্যায়, সুবিচার, সত্য কথা ইত্যাদি। — (কামুস ও রাগেব)

এখন লক্ষ্য করা দরকার যে, আয়াতে হেকমতের কি অর্থ? তাফসীরকার সাহাবীগণ হুযূরে আকরাম (সাঃ)-এর কাছ থেকে শিখে কোরআনের ব্যাখ্যা করতেন। এখানে হেকমত শব্দের অর্থে তাঁদের ভাষা ভিন্ন ভিন্ন হলেও সবগুলোর মর্মই এক। অর্থাৎ , রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুন্নাহ্। ইবনে কাসীর ও ইবনে জরীর কাতাদাহ্ থেকে এ ব্যাখ্যাই উদ্ধৃত করেছেন। হেকমতের অর্থ কেউ কোরআনের তফসীর, কেউ ধর্মে গভীর জ্ঞান, কেউ শরীয়তের বিধি-বিধানের জ্ঞান, কেউ এমন বিধি-বিধানের জ্ঞান অর্জন বলেছেন, যা শুধু রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর বর্ণনা থেকেই জানা যায়। নিঃসন্দেহে এসব উক্তির সারমর্ম হল রসূল (সাঃ)-এর সুন্নাহ্।

وَيُزَكِّيهِمْ — زَكٰوة শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ পবিত্রতা। বাহ্যিক ও আত্মিক সর্বপ্রকার পবিত্রতার অর্থেই এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

উপরোক্ত ব্যাখ্যার দ্বারা আয়াতের মর্ম সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ) ভবিষ্যত বংশধরদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্য আল্লাহ্র কাছে দোয়া করেছেন যে, আমার বংশধরের মধ্যে একজন পয়গম্বর প্রেরণ করুন— যিনি আপনার আয়াতসমূহ তাদের তেলাওয়াত করে শোনাবেন, কোরআন ও সুন্নাহ্র শিক্ষা দেবেন এবং বাহ্যিক ও আত্মিক অপবিত্রতা থেকে তাদের পবিত্র করবেন। দোয়ায় নিজের বংশধরের মধ্য থেকেই পয়গম্বর হওয়ার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ প্রথমতঃ এই যে, এটা তাঁর সন্তানদের জন্যে গৌরবের বিষয়। দ্বিতীয়তঃ এতে তাদের কল্যাণও নিহিত রয়েছে। কারণ, স্বগোত্র থেকে পয়গম্বর হলে তাঁর চাল-চলন ও অভ্যাস-আচরণ সম্পর্কে তারা উত্তমরূপে অবগত থাকবে। ধোঁকাবাজি ও প্রবঞ্চনার সম্ভাবনা থাকবে না। হাদীসে বলা হয়েছে ঃ প্রত্যুত্তরে ইবরাহীম (আঃ)-কে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বলে দেয়া হয় যে, আপনার দোয়া কবুল হয়েছে এবং কাঙ্ক্ষিত পয়গম্বরকে শেষ যমানায় প্রেরণ করা হবে।' — (ইবনে-জরীর, ইবনে-কাসীর)

রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জন্মের বৈশিষ্ট্য ঃ মুসনাদে-আহ্মদ গ্রন্থে উদ্ধৃত এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, মহানবী (সাঃ) বলেন ঃ 'আমি আল্লাহ্র কাছে তখনও পয়গাম্বর ছিলাম, যখন আদম (আঃ)-ও পয়দা হননি ; বরং তাঁর সৃষ্টির জন্য উপাদান তৈরী হচ্ছিল মাত্র। আমি আমার সূচনা বলে দিচ্ছি ঃ আমি পিতা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর দোয়া, ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদ এবং স্বীয় জননীর স্বপ্নের প্রতীক। ঈসা (আঃ)-এর সুসংবাদের অর্থ তাঁর এ উক্তি وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ আমি এমন এক পয়গম্বরের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আসবেন। তাঁর নাম আহমদ।) তাঁর জননী গর্ভাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পেট থেকে একটি নূর বের হয়ে সিরিয়ার প্রাসাদসমূহ আলোকোজ্জ্বল করে তুলেছে। কোরআনে হুযূর (সাঃ)-এর আবির্ভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে দু'জায়গায় সূরা আলে-ইমরানের ১৬৪ তম আয়াতে এবং সূরা জুমু'আয় ইবরাহীমের দোয়ায় উল্লেখিত ভাষারই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যে পয়গম্বরের জন্যে দোয়া করেছিলেন, তিনি হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ মোস্তফা (সাঃ)।

পয়গম্বর প্রেরণের অর্থ তিনটি ঃ সূরা বাক্বারার আলোচ্য আয়াতে এবং সূরা আলে-ইমরান ও সূরা জুমু'আর বিভিন্ন আয়াতে হুযূর (সাঃ) সম্পর্কে একই বিষয়বস্তু অভিন্ন ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। এসব আয়াতে মহানবী (সাঃ)-এর পৃথিবীতে পদার্পণ ও তাঁর রেসালতের তিনটি লক্ষ্য বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ কোরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়তঃ আসমানী গ্রন্থ ও হেকমতের শিক্ষাদান এবং তৃতীয়ত ঃ মানুষের চরিত্রশুদ্ধি।

প্রথম উদ্দেশ্য কোরআন তেলাওয়াত ঃ এখানে সর্বপ্রথম প্রণিধানযোগ্য যে, তেলাওয়াতের সম্পর্ক শব্দের সাথে এবং শিক্ষাদানের সম্পর্ক অর্থের সাথে। তেলাওয়াত ও শিক্ষাদান পৃথক পৃথকভাবে বর্ণিত হওয়ার মর্মার্থ এই যে, কোরআনের অর্থসম্ভার যেমন উদ্দেশ্য, শব্দসম্ভারও তেমনি একটি লক্ষ্য। এসব শব্দের তেলাওয়াত ও হেফাযত ফরয ও গুরুত্বপূর্ণ এবাদত। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, যাঁরা মহানবী (সাঃ)-এর প্রত্যক্ষ শিষ্য ও সম্বোধিত ছিলেন তাঁরা শুধু আরবী ভাষা সম্পর্কেই ওয়াকিবহাল ছিলেন না, বরং অলংকারপূর্ণ আরবী ভাষার একেকজন বাগ্মী কবিও ছিলেন। তাঁদের সামনে কোরআন পাঠ করাই বাহ্যতঃ তাঁদের শিক্ষাদানের জন্য যথেষ্ট ছিল, পৃথকভাবে অনুবাদ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল না। এমতাবস্থায় কোরআন তেলাওয়াতকে পৃথক উদ্দেশ্য এবং গ্রন্থ শিক্ষাদানকে পৃথক উদ্দেশ্য সাব্যস্ত করার কি প্রয়োজন ছিল? অথচ কার্যক্ষেত্রে উভয় উদ্দেশ্যই এক হয়ে যায়। চিন্তা করলে এ থেকে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উদ্ভব হয়। প্রথম এই যে, কোরআন অপরাপর গ্রন্থের মত নয়— যাতে শুধু অর্থসম্ভারের উপর আমল করাই উদ্দেশ্য হয়ে থাকে এবং শব্দসম্ভার থাকে দ্বিতীয় পর্যায়ে; শব্দে সামান্য পরিবর্তন পরিবর্ধন হয়ে গেলেও ক্ষতির কারণ মনে করা হয় না। অর্থ না বুঝে এসব গ্রন্থের শব্দ পাঠ করা একেবারেই নিরর্থক, কিন্তু কোরআন এমন নয়। কোরআনের শব্দের সাথে বিশেষ বিশেষ বিধি-বিধান সম্পৃক্ত রয়েছে। ফেকাহ্শাস্ত্রের মূলনীতিসংক্রান্ত গ্রন্থসমূহে কোরআনের সংজ্ঞা এভাবে هو النظم والمعنى جميعا বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, শব্দসম্ভার ও অর্থসম্ভার উভয়ের সমন্বিত গ্রন্থের নামই কোরআন। এতে বুঝা যায় যে, কোরআনের অর্থসম্ভারকে অন্য শব্দ অথবা অন্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হলে তাকে কোরআন বলা যাবে না, যদিও বিষয়বস্তু একেবারে নির্ভুল ও ক্রটিমুক্ত হয়। কোরআনের বিষয়বস্তুকে পরিবর্তিত শব্দের মাধ্যমে কেউ নামাযে পাঠ করলে তার নামায হবে না। এমনিভাবে কোরআন সম্পর্কিত অপরাপর বিধি-বিধানও এর প্রতি প্রযোজ্য হবে না। এ কারণেই ফেকাহ্শাস্ত্রবিদগণ কোরআনের মূল শব্দ বাদ দিয়ে শুধু অনুবাদ লিখতে ও মুদ্রিত করতে নিষেধ করেছেন। সাধারণ পরিভাষায় এ জাতীয় অনুবাদকে 'উর্দু কোরআন, বাংলা কোরআন অথবা ইংরেজী কোরআন' বলা হয়। কারণ, ভাষান্তরিত কোরআন প্রকৃতপক্ষে কোরআন বলে কথিত হওয়ারই যোগ্য নয়।

অর্থ না বুঝে কোরআনের শব্দ পাঠ করা নিরর্থক নয়— সওয়াবের কাজ ঃ

একথা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, অর্থ না বুঝে তোতাপাখীর মত শব্দ পাঠ করা অর্থহীন। বিষয়টির প্রতি বিশেষ জোর দেয়ার কারণ এই যে, আজকাল অনেকেই কোরআনকে অন্যান্য গ্রন্থের সাথে তুলনা করে মনে করে যে, অর্থ না বুঝে কোন গ্রন্থের শব্দাবলী পড়া ও পড়ানো বৃথা কালক্ষেপণ বৈ কিছুই নয়। কোরআন সম্পর্কে তাদের এ ধারণা ঠিক নয়। কারণ, শব্দ ও অর্থ উভয়টির সমন্বিত আসমানী গ্রন্থের নামই কোরআন। কোরআনের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা এবং তার বিধি-বিধান পালন করা যেমন ফরয ও উচ্চস্তরের এবাদত, তেমনিভাবে তার শব্দ তেলাওয়াত করাও একটি স্বতন্ত্র এবাদত ও সওয়াবের কাজ।

দ্বিতীয় উদ্দেশ্য গ্রন্থ শিক্ষাদান ঃ রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরাম কোরআনের অর্থ সম্পর্কে সমধিক জ্ঞাত ছিলেন। কিন্তু উপরোক্ত কারণেই তাঁরা শুধু অর্থ বোঝে ও তা বাস্তবায়ন করাকেই যথেষ্ট মনে করেননি। বোঝা এবং আমল করার জন্যে একবার পড়ে নেয়াই যথেষ্ট

ছিল, কিন্তু তাঁরা সারা জীবন কোরআন তেলাওয়াতকে 'অন্ধের যষ্টি' মনে করেছেন। কতক সাহাবী দৈনিক একবার কোরআন খতম করতেন, কেউ দু'দিনে এবং কেউ তিন দিনে কোরআন খতমে অভ্যস্ত ছিলেন। প্রতি সপ্তাহে কোরআন খতম করার রীতি মুসলমানদের মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। কোরআনের সাত মনযিল এই সাপ্তাহিক তেলাওয়াত রীতিরই চিহ্ন। রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও সাহাবায়ে-কেরামের এ কার্যধারাই প্রমাণ করে যে, কোরআনের অর্থ বোঝা এবং সে অনুযায়ী আমল করা যেমন এবাদত, তেমনিভাবে শব্দ তেলাওয়াত করাও স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে একটি উচ্চস্তরের এবাদত এবং বরকত, সৌভাগ্য ও মুক্তির উপায়। এ কারণেই রসূলুল্লাহ (সাঃ)- কর্তব্যসমূহের মধ্যে কোরআন তেলাওয়াতকে একটি স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়েছেন। উদ্দেশ্য এই যে, যে মুসলমান আপাততঃ কোরআনের অর্থ বোঝে না, শব্দের সওয়াব থেকেও বঞ্চিত হওয়া তার পক্ষে উচিত নয়। বরং অর্থ বোঝার জন্যে চেষ্টা অব্যাহত রাখা জরুরী, যাতে কোরআনের সত্যিকার নূর ও বরকত প্রত্যক্ষ করতে পারে এবং কোরআন অবতরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়। (মা'আযাল্লাহ,) কোরআনকে তন্ত্র-মন্ত্র মনে করে শুধু ঝাড়-ফুঁকে ব্যবহার করা উচিত নয় এবং আল্লামা ইকবালের ভাষায় 'সূরা ইয়াসীন সম্পর্কে শুধু এরূপ ধারণা করা সঙ্গত নয় যে, এ সূরা পাঠ করলে মরণোন্মুখ ব্যক্তির আত্মা সহজে নির্গত হয়।'

তৃতীয় উদ্দেশ্য পবিত্রকরণ ঃ মহানবী (সাঃ)-এর তৃতীয় কর্তব্য হচ্ছে পবিত্রকরণ। এর অর্থ বাহ্যিক ও আত্মিক না-পাকী থেকে পবিত্র করা। বাহ্যিক না-পাকী সম্পর্কে সাধারণ মুসলমানরাও ওয়াকিফহাল। আত্মিক না-পাকী হচ্ছে কুফর, শেরক, আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপর পুরোপুরি ভরসা করা, অহংকার, হিংসা, শত্রুতা দুনিয়া প্রীতি ইত্যাদি। কোরআন ও সুন্নাহতে এসব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। পবিত্রকরণকে রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পৃথক কর্তব্য সাব্যস্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কোন শাস্ত্র পুঁথিগতভাবে শিক্ষা করলেই তার প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জিত হয় না। প্রয়োগ ও পূর্ণতা অর্জন করতে হলে গুরুজনের শিক্ষাধীনে থেকে তাঁর অনুশীলনের অভ্যাসও গড়ে তুলতে হয়। সূফীবাদে কামেল পীরের দায়িত্বও তাই। তিনি কোরআন ও সুন্নাহ থেকে অর্জিত শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে অনুশীলন করে অভ্যাসে পরিণত করার চেষ্টা করেন।

হেদায়েত ও সংশোধনের দু'টি ধারা ঃ আল্লাহ্‌র গ্রন্থ ও রসূল ঃ এ প্রসঙ্গে আরও দু'টি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। প্রথম এই যে, আল্লাহ তাআলা সৃষ্টির আদিকাল থেকে শেষ নবী মুহাম্মদ (সাঃ) পর্যন্ত মানুষের হেদায়েত ও সংশোধনের জন্য দু'টি ধারা অব্যাহত রেখেছেন। একটি খোদায়ী গ্রন্থসমূহের ধারা এবং অপরটি রসূলগণের ধারা। আল্লাহ তাআলা শুধু গ্রন্থ নাযিল করাই যেমন যথেষ্ট মনে করেননি, তেমনি শুধু রসূল প্রেরণ করেও ক্ষান্ত হননি। বরং সর্বদা উভয় ধারা অব্যাহত রেখেছেন। এতদুভয় ধারা সমভাবে প্রবর্তন করে আল্লাহ তাআলা একটি বিরাট শিক্ষার দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। তা এই যে, মানুষের নির্ভুল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্যে শুধু গ্রন্থ কিংবা শুধু শিক্ষাই যথেষ্ট নয়; বরং একদিকে খোদায়ী হেদায়েত ও খোদায়ী সংবিধানেরও প্রয়োজন, যাকে কোরআন বলা হয় এবং অপরদিকে একজন শিক্ষাগুরুরও প্রয়োজন যিনি স্বীয় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে খোদায়ী হেদায়েতে অভ্যস্ত করে তুলবেন। কারণ, মানুষই মানুষের প্রকৃত শিক্ষাগুরু হতে পারে। গ্রন্থ কখনও গুরু বা অভিভাবক হতে পারে না—তবে শিক্ষা-দীক্ষায় সহায়ক অবশ্যই হতে পারে।

ইসলামের সূচনা একটি গ্রন্থ ও একজন রসূলের মাধ্যমে হয়েছে। এ দু'য়ের সম্মিলিত শক্তিই জগতে একটি সুষ্ঠু ও উচ্চস্তরের আদর্শ সমাজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। এমনিভাবে ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যেও একদিকে পবিত্র শরীয়ত ও অন্যদিকে কৃতী পুরুষগণ রয়েছেন। কোরআনও নানাস্থানে এ সম্পর্কে নির্দেশ দিয়েছে। এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ 'হে মুমিনগণ, আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক।'

সমগ্র কোরআনের সারমর্ম হল সূরা ফাতেহা। আর সূরা ফাতেহার সারমর্ম হল সিরাতে-মুস্তাকীমের হেদায়েত। এখানে সিরাতে মুস্তাকীমের সন্ধান দিতে গিয়ে কোরআনের পথ, রসূলের পথ অথবা সুন্নাহর পথ বলার পরিবর্তে কিছু খোদাভক্তের সন্ধান দেয়া হয়েছে যে, তাদের কাছ থেকে সিরাতে-মুস্তাকীমের সন্ধান জেনে নাও। বলা হয়েছে ঃ

'সিরাতে-মুস্তাকীম হল তাদের পথ, যাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামত বর্ষিত হয়েছে। তাদের পথ নয়, যারা গযবে পতিত ও গোমরাহ।' অন্য এক জায়গায় নেয়ামত প্রাপ্তদের আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ

فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ

— এমনিভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ)- ও পরবর্তীকালের জন্যে কিছুসংখ্যক লোকের নাম নির্দিষ্ট করে তাদের অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিরমিযীর রেওয়ায়েতে বলা হয়েছে ঃ

— 'হে মানবজাতি, আমি তোমাদের জন্যে দু'টি বস্তু ছেড়ে যাচ্ছি। এতদুভয়কে শক্তভাবে আঁকড়ে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কিতাব এবং অপরটি আমার সন্তান ও পরিবার-পরিজন। সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে ঃ 'আমার পরে তোমারা আবু বকর ও ওমরের অনুসরণ করবে।' অন্য এক হাদীসে আছে, 'আমার সুন্নত ও খোলাফায়ে-রাশেদীনের সুন্নত অবলম্বন করা তোমাদের কর্তব্য।'

মোটকথা, কোরআনের উপরোক্ত নির্দেশ ও রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর শিক্ষা থেকে একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, মানুষের হেদায়েতের জন্যে সর্বকালেই দু'টি বস্তু অপরিহার্য। (১) কোরআনের হেদায়েত এবং (২) তা হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশে ও আমলের যোগ্যতা অর্জনের জন্যে শরীয়ত-বিশেষজ্ঞ ও আল্লাহ-ভক্তদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ রীতি শুধু ধর্মীয় শিক্ষার বেলাতেই প্রযোজ্য নয়; বরং যে কোন বিদ্যা ও শাস্ত্র নিখুঁতভাবে অর্জন করতে হলে এ রীতি অপরিহার্য। একদিকে শাস্ত্রসমৃদ্ধীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি থাকতে হবে এবং অন্যদিকে থাকতে হবে শাস্ত্রবিদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা। প্রত্যেক শাস্ত্রের উন্নতি ও পূর্ণতার এ দু'টি অবলম্বন থেকে উপকার লাভের ক্ষেত্রে বহু মানুষ ভুল পন্থার আশ্রয় নেয়। ফলে উপকারের পরিবর্তে অপকার এবং মঙ্গলের পরিবর্তে অমঙ্গলই ঘটে বেশী।

কেউ কেউ কোরআনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করে শুধু ওলামা ও মাশায়েখকেই সবকিছু মনে করে বসে। তারা শরীয়তের অনুসারী কি না, তারও খোঁজ নেয় না। এ রোগটি আসলে ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের থেকেই সংক্রামিত হয়েছে। কোরআন বলে ঃ

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

অর্থাৎ, 'তারা আল্লাহ্‌কে ছেড়ে তাদের ওলামা ও মাশায়েখকে স্বীয় উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে।' এটা নিঃসন্দেহে শিরক ও কুফরের রাস্তা। লক্ষ

লক্ষ মানুষ এ রাস্তায় বের হয়েছে এবং হচ্ছে। পক্ষান্তরে এমন কিছু লোক রয়েছে; যারা কোরআন ও হাদীসের শিক্ষা অর্জনের জন্য কোন ওস্তাদ ও অভিভাবকের প্রয়োজনই মনে করে না। তারা বলে ঃ 'আল্লাহ্‌র কিতাব কোরআনই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' এটাও আরেক পথভ্রষ্টতা। এর ফল হচ্ছে ধর্মচ্যুত হয়ে মানবীয় প্রবৃত্তির শিকারে পরিণত হওয়া। কেননা, বিশেষজ্ঞদের সাহায্য ব্যতিরেকে শাস্ত্র অর্জন মানুষের স্বভাববিরুদ্ধ কাজ। এরূপ ব্যক্তি অবশ্যই ভুল বোঝাবুঝির শিকারে পরিণত হয়। এ ভুল বোঝাবুঝি কোন কোন সময় তাকে ধর্মচ্যুতও করে দেয়।

কোরআন সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ অর্থাৎ, ' আমিই কোরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর হেফাযত করব।'

এ ওয়াদার ফলেই কোরআনের প্রতিটি যের ও যবর পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংরক্ষিত রয়েছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত থাকবে। সুন্নাহ্‌র ভাষা যদিও এভাবে সংরক্ষিত নয়, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে সুন্নাহ্‌এবং হাদীসেরও সংরক্ষিত হওয়া উল্লেখিত আয়াতদৃষ্টে অপরিহার্য। বাস্তবে সুন্নাহ এবং হাদীসও সংরক্ষিত রয়েছে। যখনই কোন পক্ষ থেকে এতে কোন বাধা সৃষ্টি অথবা মিথ্যা রেওয়ায়েত সংমিশ্রিত করা হয়েছে, তখনই হাদীস বিশেষজ্ঞরা এগিয়ে এসেছেন এবং দুধ ও পানিকে পৃথক করে দিয়েছেন। কেয়ামত পর্যন্ত এ কর্মধারা অব্যাহত থাকবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেন, আমার উম্মতে কেয়ামত পর্যন্ত সত্যপন্থী এমন একদল আলেম থাকবেন, যারা কোরআন ও হাদীসকে বিশুদ্ধ অবস্থায় সংরক্ষিত রাখবেন এবং সকল বাধা-বিপত্তির অবসান ঘটাবেন।

মোটকথা, কোরআন বাস্তবায়নের জন্যে রসূলের শিক্ষা অপরিহার্য। কোরআনের বাস্তবায়ন কেয়ামত পর্যন্ত ফরয। কাজেই রসূলের শিক্ষাও কেয়ামত পর্যন্ত সংরক্ষিত থাকা অবশ্যম্ভাবী। অতএব, উল্লেখিত আয়াতে কেয়ামত পর্যন্ত রসূলের শিক্ষা সংরক্ষিত হওয়ারও ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। আল্লাহ্ তাআলা সাহাবায়ে কেরামের আমল থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত একে হাদীস বিশারদ ওলামা ও বিশুদ্ধ গ্রন্থাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত রেখেছেন। সাম্প্রতিককালে কিছু লোক ইসলামী বিধি-বিধান থেকে গা বাঁচানোর উদ্দেশে একটি অজুহাত আবিস্কার করেছে যে, হাদীসের বর্তমান ভাণ্ডার সংরক্ষিত ও নির্ভরযোগ্য নয়। উপরোক্ত বক্তব্যের মাধ্যমে তাদের ধর্মদ্রোহিতার স্বরূপই ফুটে উঠেছে। তাদের বোঝা উচিত যে, হাদীসের ভাণ্ডার থেকে আস্থা উঠে গেলে কোরআনের উপরও আস্থা রাখার উপায় থাকে না।

সংশোধনের নিমিত্ত বিশুদ্ধ শিক্ষাই যথেষ্ট নয়, চারিত্রিক প্রশিক্ষণও আবশ্যক ঃ পবিত্রকরণকে একটি স্বতন্ত্র কর্তব্য সাব্যস্ত করার মধ্যে ইঙ্গিত দান করা হয়েছে যে, শিক্ষা যতই বিশুদ্ধ হোক না কেন, প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত মুরুব্বীর অধীন কার্যতঃ প্রশিক্ষণ লাভ না করা পর্যন্ত শুধু শিক্ষা দ্বারাই চরিত্র সংশোধিত হয় না। কারণ, শিক্ষার কাজ হল প্রকৃতপক্ষে সরল ও নির্ভুল পথ প্রদর্শন। এ কথা সুস্পষ্ট যে, পথ জানা থাকাই গন্তব্যস্থলে পৌছার জন্যে যথেষ্ট নয়। এ জন্যে সাহস করে পা বাড়াতে হবে এবং চলতেও হবে। সাহসী বুযুর্গদের সংসর্গ ও আনুগত্য ছাড়া সাহস অর্জিত হয় না। যে সব সৌভাগ্যবান ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর সামনে শিক্ষা অর্জন করেছেন, শিক্ষার সাথে সাথে তাঁদের আত্মিক পরিশুদ্ধিও সম্পন্ন হয়েছে। এভাবে তাঁর প্রশিক্ষণাধীনে সাহাবিগণের যে একটি দল তৈরী হয়েছিল, একদিকে তাঁদের জ্ঞান-বুদ্ধির গভীরতা ছিল বিস্ময়কর; বিশ্বের দর্শন তাঁদের সামনে হার মেনেছিল এবং অন্যদিকে তাঁদের আত্মিক পবিত্রতা, আল্লাহ্‌র সাথে সম্পর্ক এবং আল্লাহ্‌র উপর ভরসাও ছিল অভাবনীয়। স্বয়ং কোরআন তাদের প্রশংসায় বলে ঃ

'যারা পয়গম্বরের সঙ্গে রয়েছে, তারা কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং পরস্পর সদয়। তুমি তাদের রুকু-সেজদা করতে দেখবে। তারা আল্লাহ্‌র কৃপা ও সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে।'

এ কারণেই তাঁরা যে দিকে পা বাড়াতেন, সাফল্য ও কৃতকার্যতা তাঁদের পদচুম্বন করত এবং আল্লাহ্‌র সাহায্য ও সমর্থন তাঁদের সাথে থাকত। তাঁদের বিস্ময়কর কীর্তিসমূহ আজও জাতিধর্ম নির্বিশেষে সবার মস্তিষ্ককে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছে। বলাবাহুল্য, এগুলো শিক্ষা ও প্রশিক্ষণেরই ফল। বর্তমান পৃথিবীতে শিক্ষার মনোন্নয়নের লক্ষ্যে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের চিন্তা সবাই করেন। কিন্তু শিক্ষার প্রাণ সংশোধনের দিক মোটেই মনোযোগ দেয়া হয় না। অর্থাৎ, শিক্ষক ও শিক্ষাগুরুর চারিত্রিক সংশোধন এবং সংস্কারক সুলভ প্রশিক্ষণের উপর জোর দেয়া হয় না। ফলে হাজারো চেষ্টাযত্নের পরও এমন কৃতী পুরুষের সৃষ্টি হয় না, যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও বলিষ্ঠতা অন্যের উপরও প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং অন্যকে প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষকবর্গ যে ধরনের জ্ঞানগরিমা ও চরিত্রের অধিকারী হবেন, তাদের শিক্ষাধীন ছাত্রসমাজও বেশীর চেয়ে বেশী তাদের মতই হতে পারবে। একারণে শিক্ষাকে কল্যাণকর ও উন্নত করতে হলে পাঠ্যসূচীর পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চাইতে শিক্ষকদের শিক্ষাগত, কর্মগত ও চরিত্রগত অবস্থার প্রতি অধিক নজর দেয়া আবশ্যক।

এ পর্যন্ত নবুওয়ত ও রিসালতের তিনটি উদ্দেশ্য বর্ণিত হল। পরিশেষে সংক্ষেপে আরও জানা প্রয়োজন যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত তিনটি কর্তব্য তিনি কতদূর বাস্তবায়িত করেছেন; এ ব্যাপারে তাঁর সাফল্য কতটুকু হয়েছে? এর জন্য এতটুকু জানাই যথেষ্ট যে, তাঁর তিরোধানের সময় সমগ্র আরব উপত্যকার ঘরে ঘরে কোরআন তেলাওয়াত হত। হাজার হাজার হাফেজ ছিলেন। শত শত লোক দৈনিক অথবা প্রতি তৃতীয় দিনে কোরআন খতম করতেন। কোরআন ও হিকমত শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল।

বিশ্বের সমগ্র দর্শন কোরআনের সামনে নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল। তওরাত ও ইঞ্জীলের বিকৃত সংকলনসমূহ গল্প-কাহিনীতে পর্যবসিত হয়েছিল, কিন্তু কোরআনের নীতিমালাকে সম্মান ও শিষ্টাচারের মানদন্ড গণ্য করা হত। অপরদিকে 'তাযকিয়া' তথা পবিত্রকরণও চরম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। এককালের দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরাও চরিত্র-দর্শনের শ্রেষ্ঠ গুরুর আসনে আসীন হয়েছিলেন। চরিত্রহীনতার রোগীরা শুধু রোগমুক্তই হয়নি, সফল চিকিৎসকের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। যারা দস্যু ছিল তারা পথপ্রদর্শক হয়ে গেল। মূর্তিপূজারীরা মূর্তমান ত্যাগ ও সহানুভূতি হয়ে গিয়েছিল। কঠোরতা ও যুদ্ধলিপ্সার স্থলে নম্রতা ও পারস্পরিক শান্তি বিরাজমান ছিল। এক সময় ডাকাতিই যাদের পেশা ছিল, তারাই মানুষের ধন-সম্পদের রক্ষকে পরিণত হয়েছিল।

মোটকথা, হযরত খলীলুল্লাহ্ (আঃ)-এর দোয়ার ফলে যে তিনটি কর্তব্য রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর উপর অর্পিত হয়েছিল, তাতে তিনি স্বীয় জীবদ্দশায়ই পরিপূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছিলেন। তাঁর তিরোধানের পর তাঁর সহচরগণ এগুলোকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে তথা সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত করে দিয়েছিলেন।

আলোচ্য আয়াতসমূহে সন্তানদের ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণের

প্রতি পয়গম্বরগণের বিশেষ মনোযোগের কথা বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ আয়াতে ইবরাহিমী দ্বীনের শ্রেষ্ঠত্ব এবং এর দৌলতেই ইহকাল ও পরকালে ইবরাহীম (আঃ)–এর সম্মান লাভের কথা বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি এ ধর্ম থেকে বিমুখ হয়, সে নির্বোধদের স্বর্গে বাস করে।

وَمَنْ يَّرْغَبُ عَنْ مِّلَّةِ اِبْرٰهٖمَ اِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهٗ অর্থাৎ, ইবরাহিমী ধর্ম থেকে সে ব্যক্তিই মুখ ফিরিয়ে নিতে পারে, যার বিন্দুমাত্রও বোধশক্তি নেই। কারণ, এ ধর্মটি হুবহু স্বভাব-ধর্ম। কোন সুস্থস্বভাব ব্যক্তি এ ধর্মকে অস্বীকার করতে পারে না। পরবর্তী আয়াতে এর কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে। এতেই এ ধর্মের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব বোঝা যায় যে, আল্লাহ তাআলা এ ধর্মের দৌলতেই হযরত ইবরাহীম (আঃ)–কে ইহকালে সম্মান ও মাহাত্ম্য দান করেছেন এবং পরকালেও। ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্য সারা বিশ্বই প্রত্যক্ষ করেছে। নমরূদের মত পরাক্রমশালী সম্রাট ও তার পারিষদবর্গ একা এই মহাপুরুষের বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, ক্ষমতার যাবতীয় কলা-কৌশল তাঁর বিরুদ্ধে প্রয়োগ করেছে এবং সর্বশেষে ভয়াবহ অগ্নিকুন্ডে তাঁকে নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু জগতের যাবতীয় উপাদান ও শক্তি যে অসীম ক্ষমতাবানের আজ্ঞাধীন, তিনি নমরূদের সমস্ত পরিকল্পনাকে ধূলিস্মাৎ করে দিলেন। আল্লাহ তাআলা প্রচণ্ড আগুনকেও তাঁর বন্ধুর জন্যে পুষ্পোদ্যানে পরিণত করে দিলেন। ফলে বিশ্বের সমগ্র জাতি তাঁর অপরিসীম মাহাত্ম্যের সামনে মাথা নত করতে বাধ্য হল। বিশ্বের সমস্ত মুমিন ও কাফির, এমনকি পৌত্তলিকেরাও এ মূর্তিসংহারকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন অব্যাহত রেখেছে। আরবের মুশরিকরা আর যাই হোক, হযরত ইবরাহীমেরই সন্তান-সন্ততি ছিল। এ কারণে মূর্তিপূজা সত্ত্বেও হযরত ইবরাহিম (আঃ)–এর সম্মান ও মাহাত্ম্য মনে-প্রাণে স্বীকার করত এবং তাঁরই ধর্ম অনুসরণের দাবী করত। ইবরাহীমী ধর্মের কিছু অস্পষ্ট চিহ্ন তাদের কাজে-কর্মেও বিদ্যমান ছিল। হজ্ব, ওমরা, কেরবানী ও অতিথি পরায়ণতা এ ধর্মেরই নিদর্শন। তবে তাদের মূর্খতার কারণে এগুলো বিকৃত হয়ে পড়েছিল। বলাবাহুল্য, এটা ঐ নেয়ামতেরই ফলশ্রুতি— যার দরুন খলীলুল্লাহকে (আঃ) 'মানব নেতা' উপাধি দেয়া হয়েছিল ঃ اِنِّيْ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا

ইবরাহীম (আঃ) ও তাঁর ধর্মের অপ্রতিরোধ্য প্রাধান্য ছাড়াও এ ধর্মের জনপ্রিয়তা ও স্বভাবধর্ম হওয়ার বিষয়টি সারা দুনিয়ার সামনে প্রতিভাত হয়ে গেছে। ফলে যার মধ্যে এতটুকুও বোধশক্তি ছিল, সে এ ধর্মের সামনে মাথা নত করেছিল। এই ছিল ইবরাহীম (আঃ)–এর ইহলৌকিক সম্মান ও মাহাত্ম্যের বর্ণনা। পারলৌকিক ব্যাপারটি আমাদের সামনে উপস্থিত নেই, কিন্তু ইবরাহীম (আঃ)–এর মর্যাদা কোরআনের সে আয়াতেই ফুটে উঠেছে, যাতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা ইহকালে তাঁকে যেমন সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন, তেমনি পরকালেও তাঁর উচ্চাসন নির্ধারিত রয়েছে।

ইবরাহিমী ধর্মের মৌলনীতি আল্লাহ্‌র আনুগত্য শুধু মাত্র ইসলামেই সীমাবদ্ধ ঃ অতঃপর দ্বিতীয় আয়াতে ইবরাহিমী ধর্মের ইবরাহিমী মূলনীতি বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে ঃ

اِذْ قَالَ لَهٗ رَبُّهٗٓ اَسْلِمْ ۙ قَالَ اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, 'ইবরাহীমকে (আঃ) যখন তাঁর পালনকর্তা বললেন ঃ আনুগত্য অবলম্বন কর, তখন তিনি বললেন ঃ আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম।' এ বর্ণনা-ভঙ্গিতে একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য। আল্লাহ তাআলার (اَسْلِمْ আনুগত্য অবলম্বন কর।) সম্মোধনের উত্তরে সম্মোধনেরই ভঙ্গিতে اسلمت لك (আমি আপনার আনুগত্য অবলম্বন করলাম) বলা যেত, কিন্তু হযরত খলীল (আঃ) এ ভঙ্গি ত্যাগ করে বলেছেন, اَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعٰلَمِيْنَ অর্থাৎ, আমি বিশ্বপালকের আনুগত্য অবলম্বন করলাম। কারণ, প্রথমতঃ এতে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রেখে আল্লাহর স্থানোপযোগী গুণকীর্তনও করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এ বিষয়টিও ফুটিয়ে তোলা হয়েছে যে, আমি আনুগত্য অবলম্বন করে কারো প্রতি অনুগ্রহ করিনি; বরং এমন করাই ছিল আমার জন্য অপরিহার্য। কারণ, তিনি রাব্বুল আলামীন তথা সারা জাহানের পালনকর্তা। তাঁর আনুগত্য না করে বিশ্ব তথা বিশ্ববাসীর কোনই গত্যন্তর নেই। যে আনুগত্য অবলম্বন করে, সে স্বীয় কর্তব্য পালন করে লাভবান হয়। এতে আরও জানা যায় যে, ইবরাহিমী ধর্মের মৌলনীতির যথার্থ স্বরূপ ও এক 'ইসলাম' শব্দের মধ্যেই নিহিত—যার অর্থ আল্লাহ্‌র আনুগত্য। ইবরাহীম (আঃ)–এর ধর্মের সারমর্মও তাই। ঐসব পরীক্ষার সারমর্মও তাই, যাতে উত্তীর্ণ হয়ে আল্লাহর এ দোস্ত মর্যাদার উচ্চস্তর শিখরে পৌঁছেছেন। ইসলাম তথা আল্লাহর আনুগত্যের খাতিরেই সমগ্র সৃষ্টি। এরই জন্যে পয়গম্বরগণ প্রেরিত হয়েছিলেন এবং আসমানী গ্রন্থসমূহ নাযিল করা হয়েছে। এতে আরও বোঝা যায় যে, ইসলামই সমস্ত পয়গম্বরের অভিন্ন ধর্ম এবং ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু। হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত আগমনকারী সমস্ত রসূল ইসলামের দিকেই মানুষকে আহবান করেছেন এবং তাঁরা এরই ভিত্তিতে নিজ নিজ উম্মতকে পরিচালনা করেছেন। কোরআন স্পষ্টভাষায় বলেছে ঃ

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ .....

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ .....

'ইসলামই আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম। যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে, তা কখনও কবুল করা হবে না।'

জগতে পয়গম্বরগণ যত ধর্ম এনেছেন, নিজ নিজ সময়ে সে সবই আল্লাহ্‌র কাছে মকবুল ছিল। সুতরাং নিঃসন্দেহে সেসব ধর্মও ছিল ইসলাম—যদিও সেগুলো বিভিন্ন নামে অভিহিত হতো। যেমন, মূসা (আঃ)–এর ধর্ম, ঈসা (আঃ)–এর ধর্ম, তথা ইহুদী ধর্ম, খ্রীষ্টান ধর্ম ইত্যাদি। কিন্তু সবগুলোর স্বরূপ ছিল ইসলাম, যার মর্ম আল্লাহর আনুগত্য। তবে এ ব্যাপারে ইবরাহিমী ধর্মের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি নিজ ধর্মের নাম 'ইসলাম' রেখেছিলেন এবং স্বীয় উম্মতকে 'উম্মতে-মুসলিমাহ্' নামে অভিহিত করেছিলেন। তিনি দোয়া প্রসঙ্গে বলেছিলেন ঃ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ

অর্থাৎ, 'হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদের উভয়কে (ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে) মুসলিম (অর্থাৎ, আনুগত্যশীল) কর এবং আমাদের বংশধর থেকেও এক দলকে আনুগত্যকারী কর।' হযরত ইবরাহীম (আঃ) তাঁর সন্তানদের প্রতি ওসীয়ত প্রসঙ্গে বলেছেন ঃ

فَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ 'তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া অন্য ধর্মের উপর মৃত্যুবরণ করো না।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর পর তাঁরই প্রস্তাবক্রমে মুহাম্মদ (সাঃ)–এর উম্মত এ বিশেষ নাম লাভ করেছে। ফলে এ উম্মতের নাম হয়েছে 'মুসলমান'। এ উম্মতের ধর্মও 'মিল্লাতে-ইসলামিয়াহ' নামে

অভিহিত। কোরআনে বলা হয়েছেঃ

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا

'— এটা তোমাদের পিতা ইবরাহীমের ধর্ম। তিনিই ইতিপূর্বে তোমাদের 'মুসলমান' নামকরণ করেছেন এবং এতেও (অর্থাৎ, কোরআনেও) এ নামই রাখা হয়েছে।'

ধর্মের কথা বলতে গিয়ে ইহুদী, খ্রীষ্টান এবং আরবের মুশরিকরাও বলে যে, তারা ইবরাহিমী ধর্মের অনুসারী, কিন্তু এসব তাদের ভুল ধারণা অথবা মিথ্যা দাবী মাত্র। বাস্তবে মুহাম্মদী ধর্মই শেষ যমানায় ইবরাহিমী ধর্ম তথা স্বভাব-ধর্মের অনুরূপ।

মোটকথা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে যত পয়গম্বর আগমন করেছেন এবং যত আসমানী গ্রন্থ ও শরীয়ত অবতীর্ণ হয়েছে, সে সবগুলোর প্রাণ হচ্ছে ইসলাম তথা, আল্লাহর আনুগত্য। এ আনুগত্যের সারমর্ম হল রিপুর কামনা-বাসনার বিপরীতে আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য এবং স্বেচ্ছাচারিতার অনুসরণ ত্যাগ করে হেদায়েতের অনুসরণ।

পরিতাপের বিষয়, আজ ইসলামের নাম উচ্চারণকারী লক্ষ লক্ষ মুসলমান এ সত্য সম্পর্কে অজ্ঞ। তারা ধর্মের নামেও স্বীয় কামনা-বাসনারই অনুসরণ করতে চায়। কোরআন ও হাদীসের এমন ব্যাখ্যাই তাদের কাছে পছন্দ, যা তাদের কামনা-বাসনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তারা শরীয়তের পরিচ্ছদকে টেনে ছিন্ন-বিছিন্ন করে নিজেদের কামনার মূর্তিতে পরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে—যাতে বাহ্যদৃষ্টিতে শরীয়তেরই অনুসরণ করছে বলে মনে হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা কামনারই অনুসরণ।

গাফেলরা জানে না যে, এসব অপকৌশল ও অপব্যাখ্যার দ্বারা সৃষ্টিকে প্রতারিত করা গেলেও স্রষ্টাকে ধোঁকা দেয়া সম্ভব নয় ; তাঁর জ্ঞান প্রতিটি অণু-পরমাণুতে পরিব্যাপ্ত। তিনি মনের গোপন ইচ্ছা ও ভেদকে পর্যন্ত দেখেন ও জানেন। তাঁর কাছে খাঁটি আনুগত্য ছাড়া কোনকিছুই গ্রহণীয় নয়।

এখন আলোচ্য আয়াতসমূহে আরও একটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, ইবরাহীমের ধর্ম বলুন, আর ইসলামই বলুন, তা সমগ্র জাতি বরং সমগ্র বিশ্বের জন্যেই এক অনন্য নির্দেশনামা। এমতাবস্থায় আয়াতে যে বিশেষভাবে ইবরাহীম ও ইয়াকুব (আঃ) কর্তৃক সন্তানদের সম্বোধন করার কথা বলা হয়েছে এবং উভয় মহাপুরুষ ওসীয়তের মাধ্যমে স্বীয় সন্তানদেরকে যে ইসলামে সুদৃঢ় থাকার নির্দেশ দিয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে, এর কারণ কি ?

উত্তর এই যে, এতে বুঝা যায় যে, সন্তানের ভালবাসা ও মঙ্গলচিন্তা রেসালত এমনকি বন্ধুত্বের স্তরেরও পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্‌র বন্ধু যিনি এক সময় পালনকর্তার ইঙ্গিতে স্বীয় আদরের দুলালকে কোরবানী করতে কোমর বেঁধেছিলেন, তিনিই অন্য সময় সন্তানের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের জন্যে তাঁর পালনকর্তার দরবারে দোয়াও করেন এবং দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার সময় সন্তানকে এমন বিষয় দিয়ে যেতে চান, যা তাঁর দৃষ্টিতে সর্ববৃহৎ নেয়ামত অর্থাৎ, ইসলাম। উল্লেখিত আয়াত وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ আর আয়াত إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي এর সারমর্মও তাই। পার্থক্য এতটুকু যে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে নেয়ামত ও ধন-সম্পদ হচ্ছে দুনিয়ার ধ্বংসশীল ও নিকৃষ্ট বস্তু নিশ্চয়। অথচ পয়গম্বরগণের দৃষ্টি অনেক উর্ধ্বে। তাঁদের কাছে প্রকৃত ঐশ্বর্য হচ্ছে ঈমান ও সৎকর্ম তথা ইসলাম।

সাধারণ মানুষ মৃত্যুর সময় সন্তানকে বৃহত্তম ধন-সম্পদ দিয়ে যেতে চায়। আজকাল একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী কামনা করে, তার সন্তান মিল-ফ্যাক্টরীর মালিক হোক, আমদানী ও রফতানীর বড় বড় লাইসেন্স লাভ করুক, লক্ষ লক্ষ এবং কোটি কোটি টাকার ব্যাংক-ব্যালেন্স গড়ে তুলুক। একজন চাকুরীজীবী চায়, তার সন্তান উচ্চপদ ও মোটা বেতনে চাকুরী করুক। অপরদিকে একজন শিল্পপতি মনে-প্রাণে কামনা করে, তার সন্তান শিল্পক্ষেত্রে চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করুক। সে সন্তানকে সারা জীবনের অভিজ্ঞতালব্ধ কলা-কৌশল বলে দিতে চায়।

এমনিভাবে পয়গম্বর এবং তাঁদের অনুসারী ওলীগণের সর্ববৃহৎ বাসনা থাকে, যে বস্তুকে তাঁরা সত্যিকার চিরস্থায়ী এবং অক্ষয় সম্পদ মনে করেন, তা সন্তানরাও পুরোপুরিভাবে লাভ করুক। এজন্যেই তাঁরা দোয়া করেন এবং চেষ্টাও করেন। অন্তিম সময়ে এরই জন্য ওসীয়ত করেন।

ধর্ম ও নৈতিকতার শিক্ষা, সন্তানের জন্য বড় সম্পদ ঃ পয়গম্বরগণের এই বিশেষ আচরণের মধ্যে সাধারণ মানুষের জন্যেও একটি নির্দেশ রয়েছে। তা এই যে, তারা যেভাবে সন্তানদের লালন-পালন ও পার্থিব আরাম-আয়েশের ব্যবস্থা করে, সেভাবে ; বরং তার চাইতেও বেশী তাদের কার্যকলাপ ও চরিত্র সংশোধনের ব্যবস্থা করা দরকার। মন্দ পথ ও মন্দ কার্যকলাপ থেকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করা আবশ্যক। এরই মধ্যে সন্তানদের সত্যিকার ভালবাসা ও প্রকৃত শুভেচ্ছা নিহিত। এটা কোন বুদ্ধিমানের কাজ নয় যে, সন্তানকে রৌদ্রের তাপ থেকে বাঁচাবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, কিন্তু চিরস্থায়ী অগ্নি ও আযাবের কবল থেকে রক্ষা করার প্রতি ভ্রূক্ষেপও করবে না। সন্তানের দেহ থেকে কাঁটা বের করার জন্যে সর্ব প্রযত্নে চেষ্টা করবে, কিন্তু তাকে বন্দুকের গুলি থেকে রক্ষা করবে না।

পয়গম্বরদের কর্মপদ্ধতি থেকে আরও একটি মৌলিক বিষয় জানা যায় যে, সর্বপ্রথম সন্তানদের মঙ্গলচিন্তা করা এবং এর পর অন্য দিকে মনোযোগ দেয়া পিতা-মাতার কর্তব্য। পিতা-মাতার নিকট থেকে এটাই সন্তানদের প্রাপ্য। এতে দু'টি রহস্য নিহিত রয়েছে— প্রথমতঃ প্রাকৃতিক ও দৈহিক সম্পর্কের কারণে তারা পিতা-মাতার উপদেশ সহজে ও দ্রুত গ্রহণ করবে। অতঃপর সংস্কার প্রচেষ্টায় ও সত্য প্রচারে তারা পিতামাতার সাহায্যকারী হতে পারবে।

দ্বিতীয়ত ঃ এটাই সত্য প্রচারের সব চাইতে সহজ ও উপযোগী পথ যে, প্রত্যেক পরিবারের দায়িত্বশীল ব্যক্তি আপন পরিবার-পরিজনের সংশোধনের কাজে মনে-প্রাণে আত্মনিয়োগ করবে। এভাবে সত্য প্রচার ও সত্য শিক্ষার ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে পরিবারের দায়ত্বশীল ব্যক্তিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। ফলে পরিবারের লোকজনের শিক্ষার মাধ্যমে সমগ্র জাতিরও শিক্ষা হয়ে যায়। এ সংগঠন-পদ্ধতির প্রতি লক্ষ্য করেই কোরআন বলেঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

— 'হে মুমিনগণ, নিজেকে এবং পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে রক্ষা কর।'

মহানবী (সাঃ) ছিলেন সারা বিশ্বের রসূল। তাঁর হোদায়েত কিয়ামত পর্যন্ত সবার জন্যে ব্যাপক। তাঁকেও সর্বপ্রথম নির্দেশ দেয়া হয়েছেঃ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ অর্থাৎ, নিকট আত্মীয়দেরকে আল্লাহ্‌র শাস্তির ভয় প্রদর্শন করুন। আরও বলা হয়েছেঃ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا অর্থাৎ, পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দিন এবং নিজেও নামায অব্যাহত রাখুন।

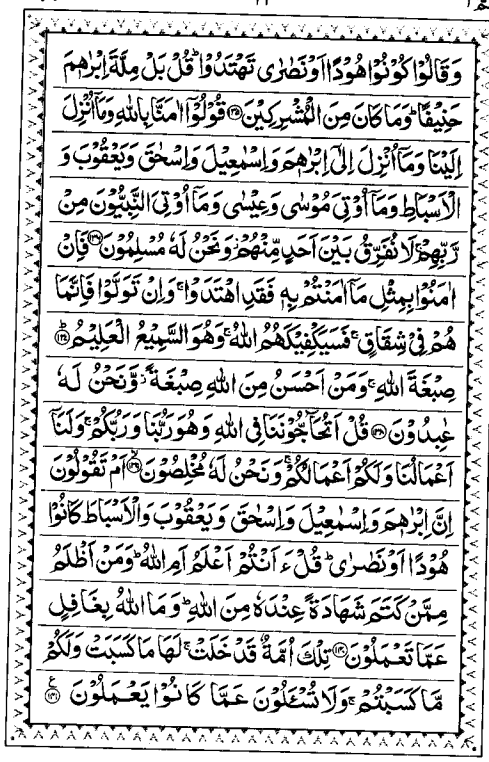
وَقَالُوْا كُوْنُوْا هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى تَهْتَدُوْا ۗ قُلْ بَلْ مِلَّةَ اِبْرٰهٖمَ
حَنِيْفًا ۗ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ﴿١٣٥﴾ قُوْلُوْٓا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَآ اُنْزِلَ
اِلَيْنَا وَمَآ اُنْزِلَ اِلٰٓى اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَ
الْاَسْبَاطِ وَمَآ اُوْتِيَ مُوْسٰى وَعِيْسٰى وَمَآ اُوْتِيَ النَّبِيُّوْنَ مِنْ
رَّبِّهِمْ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُوْنَ ﴿١٣٦﴾ فَاِنْ
اٰمَنُوْا بِمِثْلِ مَآ اٰمَنْتُمْ بِهٖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۚ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا
هُمْ فِيْ شِقَاقٍ ۚ فَسَيَكْفِيْكَهُمُ اللّٰهُ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿١٣٧﴾
صِبْغَةَ اللّٰهِ ۚ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً ۚ وَّنَحْنُ لَهٗ
عٰبِدُوْنَ ﴿١٣٨﴾ قُلْ اَتُحَآجُّوْنَنَا فِي اللّٰهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۚ وَلَنَآ
اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۚ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿١٣٩﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ
اِنَّ اِبْرٰهٖمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطَ كَانُوْا
هُوْدًا اَوْ نَصٰرٰى ۗ قُلْ ءَاَنْتُمْ اَعْلَمُ اَمِ اللّٰهُ ۗ وَمَنْ اَظْلَمُ
مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهٗ مِنَ اللّٰهِ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ
عَمَّا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٠﴾ تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ
مَّا كَسَبْتُمْ ۚ وَلَا تُسْـَٔلُوْنَ عَمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤١﴾

(১৩৫) তারা বলে, তোমরা ইহুদী অথবা খ্রীষ্টান হয়ে যাও, তবেই সুপথ পাবে। আপনি বলুন, কখনই নয় ; বরং আমরা ইবরাহীমের ধর্মে আছি যাতে বক্রতা নেই। সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। (১৩৬) তোমরা বল, আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌র উপর এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে আমাদের প্রতি এবং যা অবতীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব এবং তদীয় বংশধরের প্রতি এবং মূসা, ঈসা ও অন্যান্য নবীকে পালনকর্তার পক্ষ থেকে যা দান করা হয়েছে, তৎসমুদয়ের উপর। আমরা তাদের মধ্যে পার্থক্য করি না। আমরা তাঁরই আনুগত্যকারী। (১৩৭) এতএব তারা যদি ঈমান আনে, তোমাদের ঈমান আনার মত, তবে তারা সুপথ পাবে। আর যদি মুখ ফিরিয়ে নেয়, তবে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে। সুতরাং এখন তাদের জন্যে আপনার পক্ষ থেকে আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট। তিনিই শ্রবণকারী, মহাজ্ঞানী (১৩৮) আমরা আল্লাহ্‌র রং গ্রহণ করেছি। আল্লাহ্‌র রং- এর চাইতে উত্তম রং আর কার হতে পারে? আমরা তাঁরই এবাদত করি। (১৩৯) আপনি বলে দিন, তোমরা কি আমাদের সাথে আল্লাহ্ সম্পর্কে তর্ক করছ? অথচ তিনিই আমাদের পালনকর্তা এবং তোমাদেরও পালনকর্তা। আমাদের জন্যে আমাদের কর্ম, তোমাদের জন্যে তোমাদের কর্ম। এবং আমরা তাঁরই প্রতি একনিষ্ঠ। (১৪০) অথবা তোমরা কি বলছ যে, নিশ্চয়ই ইবরাহীম, ঈসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব (আঃ) ও তাঁদের সন্তানগণ ইহুদী অথবা খ্রীস্টান ছিলেন? আপনি বলে দিন, তোমরা বেশী জান, না আল্লাহ্ বেশী জানেন? (১৪১) তার চাইতে অত্যাচারী কে, যে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তার কাছে প্রমাণিত সাক্ষ্যকে গোপন করে? আল্লাহ্ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন। সে সম্প্রদায় অতীত হয়ে গেছে। তারা যা করেছে, তা তাদের জন্যে এবং তোমরা যা করছ, তা তোমাদের জন্যে। তাদের কর্ম সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞেস করা হবে না।

মহানবী (সাঃ) সর্বদাই এ নির্দেশ পালন করেছেন।

তৃতীয়ত ঃ আরও একটি রহস্য এই যে, কোন মতবাদ ও কর্মসূচীতে পরিবারের লোকজন ও নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন সহযোগী ও সমমনা না হলে সে মতবাদ অন্যের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। এ কারণেই প্রাথমিক যুগে মহানবী (সাঃ)-এর প্রচারকার্যের জওয়াবে সাধারণ লোকদের উত্তর ছিল যে, প্রথমে আপনি নিজ পরিবার কোরায়েশকে ঠিক করে নিন ; এরপর আমাদের কাছে আসুন। হুযুর (সাঃ)- এর পরিবারে যখন ইসলাম বিস্তার লাভ করল এবং মক্কা বিজয়ের সময় তা পরিপূর্ণ রূপ পরিগ্রহ করল, তখন এর প্রতিক্রিয়া কোরআনের ভাষায় এরূপ প্রকাশ পেল— يَدْخُلُوْنَ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا অর্থাৎ, মানুষ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করতে থাকবে।

আজকাল ধর্মহীনতার যে সয়লাব শুরু হয়েছে, তার বড় কারণ এই যে, পিতামাতা ধর্মজ্ঞানে জ্ঞানী ও ধার্মিক হলেও সন্তানদের ধার্মিক হওয়ার বিষয়ে চিন্তা করে না। সাধারণভাবে আমাদের দৃষ্টি সন্তানের পার্থিব ও স্বল্পকালীন আরাম-আয়েশের প্রতিই নিবদ্ধ থাকে এবং আমরা এর ব্যবস্থাপনায়ই ব্যতিব্যস্ত থাকি। অক্ষয় ধন-সম্পদের দিকে মনোযোগ দেই না। আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে তওফীক দিন, যাতে আমরা আখেরাতের চিন্তায় ব্যাপৃত হই এবং নিজের ও সন্তানদের জন্যে ঈমান ও নেক আমলকে সর্ববৃহৎ পুঁজি মনে করে তা অর্জনে সচেষ্ট হই।

বাপ-দাদার কৃতকর্মের ফলাফল সন্তানরা ভোগ করবে না ঃ لَهَا مَا كَسَبَتْ আয়াত থেকে বোঝা যায় যে,বাপ-দাদার সৎকর্ম সন্তানদের উপকারে আসে না— যতক্ষণ না তারা নিজেরা সৎকর্ম সম্পাদন করবে। এমনিভাবে বাপ-দাদার কুকর্মের শাস্তিও সন্তানরা ভোগ করবে না, যদি তারা সৎকর্মশীল হয়। এতে বোঝা যায় যে, মুশরিকদের সন্তান-সন্ততি সাবালক হওয়ার পূর্বে মারা গেলে পিতা-মাতার কুফর ও শিরকের কারণে তারা শাস্তি ভোগ করবে না। এতে ইহুদীদের সে দাবীও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয় যে, আমরা যা ইচ্ছা তা'ই করব, আমাদের বাপ-দাদার সৎকর্মের দ্বারাই আমাদের মাগ্‌ফেরাত হয়ে যাবে। কিন্তু তা নয়।

কোরআন এ বিষয়টি বারবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে। এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ

"প্রত্যেকের আমলের দায়িত্ব তাকেই বহন করতে হবে।" অন্য এক দায়াতে আছে ঃ "কিয়ামতের দিন একজনের বোঝা অন্যজন বহন করবে না।" রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলছেন ঃ "হে বনী-হাশেম, এমন যেন না হয় যে, কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোক নিজ নিজ সৎকর্ম নিয়ে আসবে আর তোমরা আসবে সৎকর্ম থেকে উদাসীন হয়ে শুধু বংশ গৌরব নিয়ে এবং আমি বলব যে, আল্লাহ্‌র আযাব থেকে আমি তোমাদের বাঁচাতে পারব না। অন্য এক হাদীসে আছে ঃ "আমল যাকে পেছনে ফেলে দেয়, বংশ তাকে এগিয়ে নিতে পারে না।"

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কোরআন ইয়াকুব (আঃ)-এর বংশধরকে اسباط শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছে। এটা سبط - এর বহুবচন। এর অর্থ গোত্র ও দল। তাদের سبط বলার কারণ এই যে, হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর ঔরসজাত পুত্রদের সংখ্যা ছিল বার জন। পরে প্রত্যেক পুত্রের সন্তানরা এক-একটি গোত্রে পরিণত হয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বংশে বিশেষ বরকত দান করেছিলেন। তিনি যখন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কাছে মিসরে যান, তখন সন্তান ছিল বার জন। পরে ফেরাউনের সাথে মোকাবেলার পর মূসা

(আঃ) যখন মিসর থেকে বনী–ইসরাঈলকে নিয়ে বের হলেন, তখন তাঁর সাথে ইয়াকুব (আঃ)–এর সন্তানদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ভাইয়ের সন্তান হাজার হাজার সদস্যের সমন্বয়ে একটি গোত্র ছিল। তাঁর বংশে আল্লাহ্ তা'আলা আরও একটি বরকত দান করেছেন এই যে, দশজন নবী ছাড়া সব নবী ও রসূল ইয়াকুব (আঃ)–এর বংশধরের মধ্যেই পয়দা হয়েছেন। বনী–ইসরাঈল ছাড়া অবশিষ্ট পয়গম্বরগণ হলেন, আদম (আঃ)–এর পর হযরত নূহ, শোয়াইব, হুদ, সালেহ, লূত, ইবরাহীম, ইসহাক, ইয়াকুব, ইসমাঈল ও মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ (যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে, যেরূপ তোমরা ঈমান এনেছ) – সূরা বাক্বারার প্রথম থেকে এ পর্যন্ত ঈমানের স্বরূপ কোথাও সংক্ষেপে এবং কোথাও বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। এ আয়াতের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত হলেও তাতে বিশদ বিবরণ ও ব্যাখ্যার প্রতি ইঙ্গিত নিহিত রয়েছে। কেননা, 'তোমরা ঈমান এনেছ' বাক্যে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) ও সাহাবায়ে–কেরামকে সম্বোধন করা হয়েছে। আয়াতে তাঁদের ঈমানকে আদর্শ ঈমানের মাপকাঠি সাব্যস্ত করে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য ও স্বীকৃত ঈমান হচ্ছে সে রকম ঈমান, যা রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর সাহাবায়ে কেরাম অবলম্বন করেছেন। যে ঈমান ও বিশ্বাস এ থেকে চুল পরিমাণও ভিন্ন, তা আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

এর ব্যাখ্যা এই যে, যে সব বিষয়ের উপর তাঁরা ঈমান এনেছেন, তাতে হ্রাস–বৃদ্ধি হতে পারবে না। তাঁরা যেরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান এনেছেন, তাতেও প্রভেদ থাকতে পারবে না। নিষ্ঠায় পার্থক্য হলে তা 'নিফাক' তথা কপট বিশ্বাসে পর্যবসিত হবে। আল্লাহ্র সত্তা, গুণাবলী, ফেরেশতা, নবী–রসূল, আল্লাহ্র কিতাব ও এ সবের শিক্ষা সম্বন্ধে যে ঈমান ও বিশ্বাস রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) অবলম্বন করেছেন, একমাত্র তাই আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য। এ সবের বিপরীত ব্যাখ্যা করা অথবা ভিন্ন অর্থ নেয়া আল্লাহ্র কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর উক্তি ও কর্মের মাধ্যমে ফেরেশতা ও নবী–রসূলগণের যে মর্তবা, মর্যাদা ও স্থান নির্ধারিত হয়েছে, তা হ্রাস করা অথবা বাড়িয়ে দেওয়াও ঈমানের পরিপন্থী।

এ ব্যাখ্যার ফলে কতিপয় ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের ঈমানের ত্রুটি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তারা ঈমানের দাবীদার, কিন্তু ঈমানের স্বরূপ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। ঈমানের মৌখিক দাবী মূর্তিপূজক, মুশরিক, ইহুদী, খ্রীষ্টানরাও করত এবং প্রতিটি যুগে ধর্মভ্রষ্ট বিপথগামীরাও করেছে। যেহেতু আল্লাহ্, রসূল, ফেরেশতা, কিয়ামত–দিবস ইত্যাদির প্রতি তাদের ঈমান তেমন নয়, যেমন রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর ঈমান, এ কারণে আল্লাহ্র কাছে তা ধিকৃত ও গ্রহণের অযোগ্য সাব্যস্ত হয়ে যায়।

ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের কোন কোন দল পয়গম্বরদের অবাধ্যতা করেছে। এমনকি কোন কোন পয়গম্বরকে হত্যাও করেছে। পক্ষান্তরে কোন কোন দল পয়গম্বরদের সম্মান ও মহত্ত্ব বৃদ্ধি করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'খোদা' অথবা 'খোদার পুত্র' অথবা খোদার সমপর্যায়ে নিয়ে স্থাপন করেছে। এ উভয় প্রকার ত্রুটি ও বাড়াবাড়িকেই পথভ্রষ্টতা বলে অভিহিত করা হয়েছে। بِمِثْلِ مَا آمَنتُم আয়াতে।

ইসলামী শরীয়তে রসূলের মহত্ত্ব ও ভালবাসা ফরয তথা অপরিহার্য কর্তব্য। এর অবর্তমানে ঈমানই শুদ্ধ হয় না। কিন্তু রসূলকে এলেম, কুদরত ইত্যাদি গুণে আল্লাহ্র সমতুল্য মনে করা একান্তই পথভ্রষ্টতা ও শিরক। আজকাল কোন কোন মুসলমান রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–কে 'আলেমুল–গায়েব' 'আল্লাহ্র মতই সর্বত্র বিরাজমান' উপস্থিত ও দর্শক (হাযির ও নাযির) বলেও বিশ্বাস করে। তারা মনে করে যে, এভাবে তারা মহানবী (সাঃ)–এর মহত্ত্ব ও মহব্বত ফুটিয়ে তুলছে। অথচ এটা স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)–এর নির্দেশ ও আজীবন সাধনার প্রকাশ্য বিরোধিতা। আলোচ্য আয়াতে এসব মুসলমানের জন্যেও শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ্র কাছে মহানবী (সাঃ)–এর মহত্ত্ব ও মহব্বত এতটুকু কাম্য যতটুকু সাহাবায়ে–কেরামের অন্তরে তাঁর প্রতি ছিল। এতে ত্রুটি করাও অপরাধ এবং একে বাড়িয়ে দেয়াও বাড়াবাড়ি ও পথভ্রষ্টতা।

নবী ও রসূলের যেকোন রকম মনগড়া প্রকারভেদই পথভ্রষ্টতা ঃ এমনিভাবে কোন কোন সম্প্রদায় খতমে নবুওয়ত অস্বীকার করে নতুন নবীর আগমনের পথ খুলে দিতে চেয়েছে। তারা কোরআনের সুস্পষ্ট বর্ণনা 'খাতামুন্নাবিয়ীন' (সর্বশেষ নবী)–কে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিবন্ধক মনে করে নবী ও রসূলের অনেক মনগড়া প্রকার আবিষ্কার করেছে। এসব প্রকারের নাম রেখেছে 'নবী–যিল্লী' (ছায়া–নবী) 'নবী–বুরুযী' (প্রকাশ্য–নবী) ইত্যাদি। আলোচ্য আয়াতটি তাদের অবিমৃশ্যকারিতা ও পথভ্রষ্টতার মুখোশটিকেও উম্মোচিত করে দিয়েছে। কারণ, রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) রসূলগণের উপর যে ঈমান এনেছেন, তাতে 'যিল্লী–বুরুযী' বলে কোন নাম–গন্ধও নেই। সুতরাং এটা পরিষ্কার ধর্মদ্রোহিতা।

আখেরাতের উপর ঈমান সম্পর্কে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় ঃ কিছুসংখ্যক লোকের মস্তিস্ক ও চিন্তা–ভাবনা শুধু বস্তু ও বস্তুবাচক বিষয়াদির মধ্যেই নিমজ্জিত। অদৃশ্যজগত ও পরজগতের বিষয়াদি তাদের মতে অবান্তর ও অযৌক্তিক। তারা এসব ব্যাপারে নিজে থেকে নানাবিধ ব্যাখ্যা করতে প্রবৃত্ত হয় এবং একে দ্বীনের খেদমত বলে মনে করে। তারা এসব জটিল বিষয়কে বোধগম্য করে দিয়েছে বলে মনে করে গর্বও করে। কিন্তু এসব ব্যাখ্যা بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ উক্তির পরিপন্থী হওয়ার কারণে বাতিল ও অ–গ্রহণযোগ্য। আখেরাতের অবস্থা ও ঘটনাবলী কোরআন ও হাদীসে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে, বিনা দ্বিধায় ও বিনা ব্যাখ্যায় তা বিশ্বাস করাই প্রকৃতপক্ষে ঈমান। হাশরের পুনরুত্থানের পরিবর্তে আত্মিক পুনরুত্থান স্বীকার করা এবং আযাব, সওয়াব, আমল, ওজন ইত্যাদি বিষয়ে নিজের পক্ষ থেকে ব্যাখ্যা বর্ণনা করা সবই গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কারণ।

এখলাসের তাৎপর্য ঃ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ বাক্যটিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা আল্লাহ্র ব্যাপারে নিষ্ঠাবান। নিষ্ঠা বা এখলাসের অর্থ হযরত সায়ীদ ইবনে যুবায়ের (রাঃ)–এর বর্ণনা মতে ধর্মে নিষ্ঠাবন হওয়া। অর্থাৎ, আল্লাহ্র সাথে কাউকে অংশীদার না করা এবং একমাত্র আল্লাহ্র জন্যে সৎকর্ম করা, মানুষকে দেখানোর জন্যে অথবা মানুষের প্রশংসা অর্জনের জন্যে নয়।

سَيَقُولُ السُّفَهَآءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلّٰىهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ
الَّتِىْ كَانُوْا عَلَيْهَا ۚ قُلْ لِّلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَآءُ
اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ ﴿١٤٢﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَآءَ
عَلَى النَّاسِ وَيَكُوْنَ الرَّسُوْلُ عَلَيْكُمْ شَهِيْدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِىْ
كُنْتَ عَلَيْهَآ اِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَّتَّبِعُ الرَّسُوْلَ مِمَّنْ يَّنْقَلِبُ عَلٰى عَقِبَيْهِ ۗ
وَاِنْ كَانَتْ لَكَبِيْرَةً اِلَّا عَلَى الَّذِيْنَ هَدَى اللّٰهُ ۗ وَمَا كَانَ اللّٰهُ
لِيُضِيْعَ اِيْمَانَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٤٣﴾ قَدْ نَرٰى تَقَلُّبَ
وَجْهِكَ فِى السَّمَآءِ ۚ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضٰىهَا ۖ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۗ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهَكُمْ شَطْرَهٗ ۗ وَاِنَّ الَّذِيْنَ
اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَيَعْلَمُوْنَ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِّهِمْ ۗ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا
يَعْمَلُوْنَ ﴿١٤٤﴾ وَلَئِنْ اَتَيْتَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ بِكُلِّ اٰيَةٍ مَّا تَبِعُوْا
قِبْلَتَكَ ۚ وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۚ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ ۗ
وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ اِنَّكَ
اِذًا لَّمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٤٥﴾ اَلَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَعْرِفُوْنَهٗ كَمَا يَعْرِفُوْنَ
اَبْنَآءَهُمْ ۗ وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُوْنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ﴿١٤٦﴾

(১৪২) এখন নির্বোধেরা বলবে, কিসে মুসলমানদের ফিরিয়ে দিল তাদের ঐ কেবলা থেকে, যার উপর তারা ছিল? আপনি বলুন ঃ পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্‌রই। তিনি যাকে ইচ্ছা সরল পথে চালান। (১৪৩) এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি— যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্যে এবং যাতে রসূল সাক্ষ্যদাতা হন তোমাদের জন্যে। (১৪৪) আপনি যে কেবলার উপর ছিলেন, তাকে আমি এজন্যেই কেবলা করেছিলাম, যাতে একথা প্রতীয়মান হয় যে, কে রসূলের অনুসারী থাকে আর কে পিঠটান দেয়। নিশ্চিতই এটা কেঠারতর বিষয়, কিন্তু তাদের জন্যে নয়, যাদেরকে আল্লাহ্‌ পথপ্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌, মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়। (১৪৫) নিশ্চয়ই আমি আপনাকে বার বার আকাশের দিকে তাকাতে দেখি। অতএব, অবশ্যই আমি আপনাকে সে কেবলার দিকেই ঘুরিয়ে দেব যাকে আপনি পছন্দ করেন। এখন আপনি মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করুন এবং তোমরা যেখানেই থাক, সেদিকে মুখ কর। যারা আহলে-কিতাব, তারা অবশ্যই জানে যে, এটাই ঠিক পালনকর্তার পক্ষ থেকে। আল্লাহ্‌ বেখবর নন, সে সমস্ত কর্ম সম্পর্কে যা তারা করে। (১৪৫) যদি আপনি আহলে-কিতাবদের কাছে সমুদয় নিদর্শন উপস্থাপন করেন, তবুও তারা আপনার কেবলা মেনে নেবে না এবং আপনিও তাদের কেবলা মানেন না। তারাও একে অন্যের কেবলা মানে না। যদি আপনি তাদের বাসনার অনুসরণ করেন, সে জ্ঞানলাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে নিশ্চয় আপনি অবিচারকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(১৪৬) আমি যাদেরকে কিতাব দান করেছি, তারা তাকে চেনে, যেমন করে চেনে নিজেদের পুত্রদেরকে। আর নিশ্চয়ই তাদের একটি সম্প্রদায় জেনে-শুনে সত্যকে গোপন করে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য ১৪২ তম আয়াতে কেবলা পরিবর্তন সম্পর্কে বিরোধিতাকারীদের আপত্তি বর্ণনা করে তার জওয়াব দেয়া হয়েছে। আপত্তি ও জওয়াবের পূর্বে কেবলার স্বরূপ ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

কেবলার শাব্দিক অর্থ মুখ করার দিক। প্রত্যেক এবাদতে মুমিনের মুখ এক ও অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র দিকেই থাকে। আল্লাহ্‌ পবিত্র সত্তা ; পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের বন্ধন থেকে মুক্ত, তিনি কোন বিশেষ দিকে অবস্থান করেন না। ফলে কোন এবাদতকারী ব্যক্তি যদি যে দিকে ইচ্ছা সেদিকেই মুখ করত কিংবা একই ব্যক্তি এক সময় একদিকে অন্য সময় অন্যদিকে মুখ করত, তবে তাও স্বাভাবিক নিয়মের পরিপন্থী হতো না।

কিন্তু অপর একটি রহস্যের কারণে সমস্ত এবাদতকারীর মুখ একদিকেই হওয়া উচিত। রহস্যটি এই,— এবাদত বিভিন্ন প্রকার। কিছু এবাদত ব্যক্তিগত, আর কিছু এবাদত সমষ্টিগত। আল্লাহ্‌র যিকির, রোযা প্রভৃতি ব্যক্তিগত এবাদত। এগুলো নির্জনে গোপণভাবে সম্পাদন করতে হয়। নামায ও হজ্ব সমষ্টিগত ইবাদত। এগুলো সংঘবদ্ধভাবে এবং প্রকাশ্যে সম্পাদন করতে হয়। সমষ্টিগত উপাসনার বেলায় উপাসনার সাথে সাথে মুসলমানদের সংঘবদ্ধ জীবনের রীতি-নীতিও শিক্ষা দেয়া লক্ষ্য থাকে। এটা সবারই জানা যে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার প্রধান মৌলনীতি হচ্ছে বহু ব্যক্তি ভিত্তিক ঐক্য ও একাত্মতা। এ ঐক্য যত দৃঢ় ও মজবুত হবে, সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থাও ততই শক্ত ও সুদৃঢ় হবে। ব্যক্তিকেন্দ্রিকতা এবং বিচ্ছিন্নতা উভয়টিই সংঘবদ্ধ জীবনব্যবস্থার পক্ষে নিতান্ত ক্ষতিকর। এরপর ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু কি হবে, তা নির্ধারণ করার ব্যাপারে বিভিন্ন যুগের মানুষ বিভিন্ন মত পোষণ করেছে। কোন কোন সম্প্রদায় বংশকে কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে, কেউ দেশ ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে এবং কেউ বর্ণ ও ভাষাকে।

কিন্তু আল্লাহ্‌র ধর্ম এবং পয়গম্বরদের শরীয়ত এ সব এখতিয়ার বহির্ভূত বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু করার যোগ্য মনে করেনি। প্রকৃতপক্ষে এসব বিষয় সমগ্র মানবজাতিকে একই কেন্দ্রে সমবেত করতে সমর্থও নয়। বরং চিন্তা করলে দেখা যায়, এ ধরনের ঐক্য প্রকৃতপক্ষে মানব জাতিকে বহুধা বিভক্ত করে দেয় এবং পারস্পারিক সংঘর্ষ ও মতানৈক্যই সৃষ্টি করে বেশী।

সকল পয়গম্বরের ধর্ম ইসলাম ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকেই ঐক্যের মানদণ্ড ও কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করেছে এবং কোটি কোটি উপাস্যের উপসনায় বিভক্ত বিশ্বকে এক ও অদ্বিতীয় আল্লহ্‌র এবাদত ও আনুগত্যের প্রতি আহবান জানিয়েছে। বলাবাহুল্য, একমাত্র এ কেন্দ্রবিন্দুতেই পূর্ব ও পশ্চিম, ভূত ও ভবিষ্যতের মানবমণ্ডলী একত্রিত হতে পারে। অতঃপর এ ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের ঐক্যকে বাস্তবে রূপায়ন এবং শক্তিদানের উদ্দেশে তৎসঙ্গে কিছু বাহ্যিক ঐক্যও যোগ করা হয়েছে। কিন্তু এসব বাহ্যিক ঐক্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে একটি নীতির প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে যে, ঐক্যের বিষয়বস্তু কার্যগত ও ইচ্ছাধীন হতে হবে— যাতে সমগ্র মানবমণ্ডলী স্বেচ্ছায় তা অবলম্বন করে ঐক্যসূত্রে গ্রহিত হতে পারে। বংশ, দেশ, ভাষা, বর্ণ প্রভৃতি ঐচ্ছিক বিষয় নয়। যে ব্যক্তি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, সে অন্য পরিবারে জন্মগ্রহণ করতে পারে না । যে ব্যক্তি পাকিস্তানে অথবা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছে, সে বিলেতে অথবা অফ্রিকায় জন্মগ্রহণে সক্ষম নয়। যে ব্যক্তি কৃষ্ণকায়, সে যেমন স্বেচ্ছায়

শ্বেতকায় হতে পারে না, ঠিক তেমনিভাবে একজন শ্বেতকায় ব্যক্তিও স্বেচ্ছায় কৃষ্ণকায় হতে পারে না।

এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হলে মানবতা শতধা, এমনকি সহস্রধা বিভক্ত হয়ে পড়া অপরিহার্য হয়ে যাবে। এ কারণে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সাথে জড়িত এ সব বিষয়কে ইসলাম পরিপূর্ণ সম্মান দান করলেও, মানব ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু হতে দেয়নি। তবে ইসলাম ইচ্ছাধীন বিষয়সমূহে চিন্তাগত ঐক্যের সাথে সাথে কার্যগত ও আকারগত ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেছে। এতেও এমন বিষয়কে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করার চেষ্টা করা হয়েছে, যা স্বেচ্ছায় অবলম্বন করা প্রত্যেক পুরুষ-স্ত্রী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শহুরে-গাম্য, ধনী-দরিদ্রের পক্ষে সমান সহজ। কাজেই ইসলামী শরীয়ত সারা বিশ্বের মানুষকে পোশাক, বাসস্থান ও পানাহারের ব্যাপারে কোন এক নিয়মের অধীন করেনি। কারণ, প্রত্যেক দেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ার কারণে প্রয়োজনাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এমতাবস্থায় সবাইকে একই ধরনের পোশাক ও ইউনিফর্মের অধীন করে দিলে নানা অসুবিধা দেখা দেবে। যদি ন্যূনতম কোন ইউনিফর্মেরও অধীন করে দেয়া হয়, তাতেও মানবিক সমতার প্রতি অবিচার করা হবে এবং আল্লাহ্ প্রদত্ত উৎকৃষ্ট পোশাক ও বস্ত্রের অবমাননা হবে। পক্ষান্তরে আরও বেশী দামের ইউনিফর্মের অধীন করে দেয়া হলে দরিদ্র ও নিঃস্ব লোকদের পক্ষে অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে।

এ কারণে ইসলামী শরীয়ত মুসলমানদের জন্যে কোন বিশেষ পোশাক বা ইউনিফর্ম নির্দিষ্ট করেনি, বরং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সব পন্থা ও পোশাক প্রচলিত ছিল, সবগুলো যাচাই করে অপব্যয়, অযথা গর্ব ও বিজাতীয় অনুকরণ-ভিত্তিক পন্থা ও পোশাক-পরিচ্ছদকে নিষিদ্ধ করেছে। অবশিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তি ও গোষ্ঠীকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। এমনি বিষয়াদিকে ঐক্যের কেন্দ্রবিন্দু সাব্যস্ত করা হয়েছে, যা ইচ্ছাধীন সহজলভ্য ও সস্তা। উদাহরণতঃ জামা'তের নামাযে কাতারবন্দি হওয়া, ইমামের উঠাবসার পূর্ণ অনুকরণ, হজ্বের সময় পোশাক ও অবস্থানের অভিন্নতা ইত্যাদি।

এমনিভাবে কেবলার ঐক্যও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ্র পবিত্র সত্তা যদিও যাবতীয় দিকের বন্ধন থেকে মুক্ত; তাঁর জন্য সবদিকই সমান, তথাপি নামাযে সমষ্টিগত ঐক্য সৃষ্টি করার উদ্দেশে বিশ্ববাসীর মুখমণ্ডল একই দিকে নিবদ্ধ থাকা একটি উত্তম, সহজ ও স্বাভাবিক ঐক্য পদ্ধতি। এতে পূর্ব-পশ্চিম ও উত্তর-দক্ষিণের সমগ্র মানবমণ্ডলী সহজেই একত্রিত হতে পারে। এখন সমগ্র বিশ্বের মুখ করার দিক কোনটি হবে এর মীমাংসা মানুষের হাতে ছেড়ে দিলে তাও বিরাট মতানৈক্য এবং কলহের কারণ হয়ে যাবে। একারণে এর মীমাংসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে হওয়াই বিধেয়। হযরত আদম আলাইহিস্ সালামের পৃথিবীতে অবতরণের পূর্বেই ফেরেশতাদের দ্বারা কা'বা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। আদম ও আদম-সন্তানদের জন্যে সর্বপ্রথম কেবলা কা'বাগৃহকেই সাব্যস্ত করা হয়। বলা হয়েছে ঃ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعٰلَمِيْنَ

অর্থাৎ, মানুষের জন্যে সর্বপ্রথম যে গৃহ নির্মিত হয়, তা মক্কায় অবস্থিত এবং এ গৃহ বিশ্ববাসীর জন্যে হেদায়েত ও বরকতের উৎস।

নামাযে কা'বার দিকে মুখ করাই যথেষ্ট ঃ এখানে একটি ফেকাহ্-বিষয়ক সূক্ষ্ম তত্ত্ব উল্লেখযোগ্য। আয়াতে কা'বা অথবা বায়তুল্লাহ বলার পরিবর্তে 'মসজিদে-হারাম' বলা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বসবাসকারীদের পক্ষে হুবহু কা'বাগৃহ বরাবর দাঁড়ানো জরুরী নয়, বরং পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণের মধ্য থেকে যে দিকটিতে কা'বা অবস্থিত সেদিকে মুখ করলেই যথেষ্ট হবে। তবে যে ব্যক্তি মসজিদে-হারামে উপস্থিত রয়েছে কিংবা নিকটস্থ কোন স্থান বা পাহাড় থেকে কা'বা দেখতে পাচ্ছে, তার পক্ষে এমনভাবে দাঁড়ানো জরুরী যাতে কা'বাগৃহ তার চেহারার বরাবরে থাকে। যদি কা'বাগৃহের কোন অংশ তার চেহারা বরাবরে না পড়ে, তবে তার নামায শুদ্ধ হবে না। কা'বাগৃহ যাদের চোখের সামনে নেই এ বিধান তাদের জন্যে নয়। তারা কা'বাগৃহ কিংবা মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করলেই যথেষ্ট।

وسط শব্দের অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট বিষয়। আবু সায়ীদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ মহানবী (সাঃ) عدل শব্দ দ্বারা وسط - এর ব্যাখ্যা করেছেন।—এর অর্থ সর্বোৎকৃষ্ট। (কুরতুবী) আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের একটি শ্রেষ্ঠত্ব ও ও বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে যে, তাদেরকে মধ্যবর্তী উম্মত করা হয়েছে। এর ফলে তারা হাশরের ময়দানে একটি স্বাতন্ত্র্য লাভ করবে। সকল পয়গম্বরের উম্মতরা তাঁদের হেদায়েত ও প্রচারকার্য অস্বীকার করে বলতে থাকবে, দুনিয়াতে আমাদের কাছে কোন আসমানী গ্রন্থ পৌঁছেনি এবং কোন পয়গম্বরও আমাদের হেদায়েত করেননি। তখন মুসলিম সম্প্রদায় পয়গম্বরগণের পক্ষে সাক্ষ্যদাতা হিসাবে উপস্থিত হবে এবং সাক্ষ্য দেবে যে, পয়গম্বরগণ সব যুগেই আল্লাহ্র পক্ষ থেকে আনীত হেদায়েত তাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন, তাদেরকে সঠিক পথে আনার জন্যে তাঁরা সাধ্যমত চেষ্টাও করেছেন। বিবাদী উম্মতরা মুসলিম সম্প্রদায়ের সাক্ষ্যে প্রশ্ন তুলে বলবে ঃ আমাদের আমলে এই সম্প্রদায়ের কোন অস্তিত্বই ছিল না। আমাদের ব্যাপারাদি তাদের জানার কথা নয়, কাজেই আমাদের বিপক্ষে তাদের সাক্ষ্য কেমন করে গ্রহণযোগ্য হতে পারে?

মুসলিম সম্প্রদায় এ প্রশ্নের উত্তরে বলবে ঃ নিঃসন্দেহে তখন আমাদের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আমাদের নিকট তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলী সম্পর্কিত তথ্যাবলী একজন সত্যবাদী রসূল ও আল্লাহ্র গ্রন্থ কোরআন সরবরাহ করেছে। আমরাও সে গ্রন্থের উপর ঈমান এনেছি এবং তাদের সরবরাহকৃত তথ্যাবলীকে চাক্ষুষ দেখার চাইতেও অধিক সত্য মনে করি; তাই আমাদের সাক্ষ্য সত্য। অতঃপর রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) উপস্থাপিত হবেন এবং সাক্ষীদের সমর্থন করে বলবেন ঃ তারা যাকিছু বলছে, সবই সত্য। আল্লাহ্র গ্রন্থ এবং আমার শিক্ষার মাধ্যমে তারা এসব তথ্য জানতে পেরেছে।

হাশরের ময়দানে সংঘটিতব্য এ ঘটনার বিবরণ সহীহ্ বুখারী, তিরমিযী, নাসায়ী ও মুসন'দে-আহ্মদের একাধিক হাদীসে সংক্ষেপে ও সবিস্তারে বর্ণিত রয়েছে।

মোটকথা, আলোচ্য আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করা হয়েছে। তাই এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য।

মধ্যপন্থার রূপরেখা, তার গুরুত্ব ও কিছু বিবরণ ঃ (১) মধ্যপন্থার অর্থ ও তাৎপর্য কি? (২) মধ্যপন্থার এত গুরুত্বই বা কেন যে, এর উপরই শ্রেষ্ঠত্বকে নির্ভরশীল করা হয়েছে? (৩) মুসলিম সম্প্রদায় যে মধ্যপন্থী,

বাস্তবতার নিরীখে এর প্রমাণ কি? ধারাবাহিকভাবে এ তিনটি প্রশ্নের উত্তরঃ

(১) اعتدال (ভারসাম্য)–এর শাব্দিক অর্থ সমান হওয়া। عدل মূল ধাতু থেকে এর উৎপত্তি, আর عدل এর অর্থও সমান হওয়া।

(২) যে গুরুত্বের কারণে ভারসাম্যকে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি সাব্যস্ত করা হয়েছে তা একটু ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। বিষয়টি প্রথমে একটি স্থূল উদাহরণ দ্বারা বুঝুন। ইউনানী, আয়ুর্বেদিক, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক ইত্যাদি যত নতুন ও পুরাতন চিকিৎসা-পদ্ধতি পৃথিবীতে প্রচলিত রয়েছে, সে সবই এ বিষয়ে একমত যে, 'মেযাজে'র বা স্বভাবের ভারসাম্যের উপরই মানবদেহের সুস্থতা নির্ভরশীল। ভারসাম্যের ত্রুটিই মানবদেহে রোগ-বিকার সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ ইউনানী চিকিৎসা পদ্ধতির মূলনীতিই মেজায-পরিচয়ের উপর নির্ভরশীল। এ শাস্ত্র মতে মানবদেহ চারিটি উপাদান—রক্ত, শ্লেষ্মা, অম্ল ও পিত্ত দ্বারা গঠিত। এ চারিটি উপাদান থেকে উৎপন্ন চারিটি অবস্থা শৈত্য, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও শুষ্কতা মানবদেহে বিদ্যমান থাকা জরুরী। এ চারিটি উপাদানের ভারসাম্যই মানবদেহের প্রকৃত সুস্থতা নিশ্চিত করে। পক্ষান্তরে যে কোন একটি উপাদান মেজাযের চাহিদা থেকে বেড়ে অথবা কমে গেলেই তা হবে রোগ-ব্যাধি। চিকিৎসা দ্বারা এর প্রতিকার না করলে এক পর্যায়ে তাই মৃত্যুর কারণ হবে।

এই স্থূল উদাহরণের পর এখন আধ্যাত্মিকতার দিকে আসুন। আধ্যাত্মিকতায় ভারসাম্যের নাম আত্মিক সুস্থতা এবং ভারসাম্যহীনতার নাম আত্মিক ও চারিত্রিক অসুস্থতা। এ অসুস্থতার চিকিৎসা করে ভারসাম্য ফিরিয়ে আনা না হলে পরিণামে আত্মিক মৃত্যু ঘটে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই জানে যে, যে উৎকৃষ্টতার কারণে মানুষ সমগ্র সৃষ্টিজীববের সেরা, তা তার দেহ অথবা দেহের উপাদান অথবা সেগুলোর অবস্থা, তাপ-শৈত্য নয়। কারণ, এসব উপাদান ও অবস্থার ক্ষেত্রে দুনিয়ার অন্যান্য জীব-জন্তুও মানুষের সমপর্যায়ভুক্ত; বরং তাদের মধ্যে ক্ষেত্র বিশেষে এসব উপাদান মানুষের চাইতেও বেশী থাকে।

যে বৈশিষ্ট্যের কারণে মানুষ 'আশরাফুল -মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরা বলে গণ্য হয়েছে, তা নিশ্চিতই তার রক্ত-মাংস চর্ম এবং তাপ-শৈত্যের উর্ধ্বে অন্য কোন বিষয় যা মানুষের মধ্যে পুরোপুরি বিদ্যমান—অন্যান্য সৃষ্টজীববের মধ্যে ততটুকু নেই। এ বস্তুটি নির্দিষ্ট ও চিহ্নিত করাও কোন সূক্ষ্ম ও কঠিন কাজ নয়। বলাবাহুল্য, তা হচ্ছে মানুষেরর আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠা বা পরিপূর্ণতা।

আত্মিক ও চারিত্রিক পরাকাষ্ঠাই যখন মানুষের সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি, মানবদেহের মত মানবাত্মাও যখন ভারসাম্য ও ভারসাম্যহীনতার শিকার হয় এবং মানবদেহের সুস্থতা যখন মেযাজ ও উপাদানের ভারসাম্য আর মানবাত্মার সুস্থতা যখন আত্মা ও চরিত্রের ভারসাম্য, তখন কামেল মানব একমাত্র তিনিই হতে পারেন, যিনি দৈহিক ভারসাম্যের সাথে সাথে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যেরও অধিকারী হবেন। এ উভয়বিধ ভারসাম্য সমস্ত পয়গম্বরকে বিশেষভাবে দান করা হয়েছিল এবং আমাদের রসূল (সাঃ) তা সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এ কারণে তিনি সর্বপ্রধান কামেল মানব।

আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর প্রেরণ ও গ্রন্থ অবতরণের রহস্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলোর মাধ্যমে মানুষের মধ্যে চারিত্রিক ভারসাম্য সৃষ্টি করা হবে এবং লেন-দেন ও পারস্পারিক আদান-প্রদানে বৈষয়িক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে মানদণ্ড নাযিল করা হয়েছে। মানদণ্ড অর্থ প্রত্যেক পয়গম্বরের শরীয়ত হতে পারে। শরীয়ত দ্বারা সত্যিকার ভারসাম্য জানা যায় এবং ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা যায়।

উপরোক্ত বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, মানবমণ্ডলীকে আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্যের ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করাই পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থ প্রেরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। বলাবাহুল্য, এটাই মানব মণ্ডলির সুস্থতা।

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই সর্বপ্রকার ভারসাম্য নিহিত ঃ মুলিম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছেঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا

অর্থাৎ— আমি তোমাদেরকে ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় করেছি। উপরোক্ত বর্ণনা থেকেই অনুমান করা যায় যে, وَسَطًا শব্দটি উচ্চারণ ও লেখায় একটি সাধারণ শব্দ হলেও তাৎপর্যের দিকে দিয়ে কোন সম্প্রদায় অথবা ব্যক্তির মধ্যে যত পরাকাষ্ঠা থাকা সম্ভব, সে সবগুলোকে পরিব্যপ্ত করেছে।

আয়াতে মুসলিম সম্প্রদায়কে মধ্যপন্থী, ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় বলে অভিহিত করে বলা হয়েছে যে, মানবীয় মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ভাবে বিদ্যমান। যে উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের যাবতীয় কর্মধারা অব্যাহত রয়েছে এবং পয়গম্বর ও আসমানী গ্রন্থসমূহ প্রেরিত হয়েছে, তাতে এ সম্প্রদায় অপরাপর সম্প্রদায় থেকে স্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ও শ্রেষ্ঠ।

কোরআন বিভিন্ন আয়াতে বিভিন্নভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ের এ শ্রেষ্ঠত্বের কথা বর্ণনা করেছে। সূরা আ'রাফের শেষভাগে এ সম্প্রদায় সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ اُمَّةٌ يَّهْدُوْنَ بِالْحَقِّ وَبِهٖ يَعْدِلُوْنَ অর্থাৎ, আমি যাদের সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমন একটি সম্প্রদায় রয়েছে, যারা সৎপথ প্রদর্শন করে এবং তদনুযায়ী ন্যায়বিচার করে।

এতে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ও চারিত্রিক ভারসাম্য বিধৃত হয়েছে যে, তারা ব্যক্তিগত স্বার্থ ও কামনা-বাসনা বিসর্জন দিয়ে আসমানী গ্রন্থের নির্দেশ অনুযায়ী নিজেরাও চলে এবং অন্যদেরকেও চালাবার চেষ্টা করে। কোন ব্যাপারে কলহবিবাদ সৃষ্টি হলে তার মীমাংসাও তারা গ্রন্থের সাহায্যেই করে, যাতে কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের স্বার্থপরতার কোন আশঙ্কা নেই।

সূরা আলে-ইমরানে মুসলিম সম্প্রদায়ের আত্মিক ভারসাম্য এভাবে বর্ণিত হয়েছেঃ

كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَاْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ

অর্থাৎ, তোমরাই সে শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানবজাতির কল্যাণের জন্য যাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা ভাল কাজের আদেশ করবে, মন্দকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহ্‌র উপর ঈমান রাখবে।

অর্থাৎ, মুসলমানরা যেমন সব পয়গম্বরের শ্রেষ্ঠতম পয়গম্বর প্রাপ্ত হয়েছে, সব গ্রন্থের সর্বাধিক পরিব্যপ্ত ও পূর্ণতর গ্রন্থ লাভ করেছে, তেমনি সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ মেজায এবং ভারসাম্যও সর্বাধিক পরিমাণে প্রাপ্ত হয়েছে। ফলে তারাই সকল সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায় সাব্যস্ত হয়েছে। তাদের সামনে জ্ঞানবিজ্ঞান ও তত্ত্ব-রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত করা

হয়েছে। ঈমান, আমল ও খোদাভীতির সমস্ত শাখা-প্রশাখা তাদের ত্যাগের দৌলতে সজীব ও সতেজ হয়ে উঠবে। তারা কোন বিশেষ দেশ ও ভৌগলিক সীমার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে না। তাদের কর্মক্ষেত্র হবে সমগ্র বিশ্ব এবং জীবনের সকল শাখায় পরিব্যপ্ত। তাদের অস্তিত্বই অন্যের হিতাকাঙ্খা ও তাদের বেহেশতের দ্বারে উপনীত করার কাজে নিবেদিত।

أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ বাক্যাংশে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ সম্প্রদায়টি গণ মানুষের হিতাকাঙ্খা ও উপকারের নিমিত্তই সৃষ্ট। তাদের অভীষ্ট কর্তব্য ও জাতীয় পরিচয় এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজের দিকে পথ দেখাবে এবং মন্দকাজ থেকে বিরত রাখবে।

বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভারসাম্যপূর্ণ সম্প্রদায় হওয়ার প্রমাণ কি? এখন এ প্রশ্নটি আলোচনাসাপেক্ষ। এর বিস্তারিত বিবরণ দিতে হলে বিশ্বের সকল সম্প্রদায়ের বিশ্বাস, কর্ম, চরিত্র ও কীর্তিসমূহ যাচাই করা একান্ত প্রয়োজন। নিম্নে নমুনাস্বরূপ কতিপয় বিষয় উলেখ করা হচ্ছেঃ

বিশ্বাসের ভারসাম্য ঃ সর্বপ্রথম বিশ্বাসগত ভারসাম্য নিয়েই আলোচনা করা যাক। পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা পয়গম্বরগণকে আল্লাহ্‌র পুত্র মনে করে তাদের উপাসনা ও আরাধনা করতে শুরু করেছে। যেমন, এক আয়াতে রয়েছেঃ "ইহুদীরা বলেছে, ওযায়ের আল্লাহ্‌র পুত্র এবং খ্রীষ্টানরা বলেছে, মসীহ্ আল্লাহ্‌র পুত্র"। অপরদিকে এসব সম্প্রদায়েরই অনেকে পয়গম্বরের উপর্যুপরি মো'জেযা দেখা সত্ত্বেও তাদের পয়গম্বর যখন তাদেরকে কোন ন্যায়যুদ্ধে আহবান করেছেন, তখন পরিষ্কার বলে দিয়েছেঃ "আপনি এবং আপনার পালনকর্তাই যান এবং শত্রুদের সাথে যুদ্ধ করুন। আমরা এখানেই বসে থাকব।" আবার কোথাও পয়গম্বরগণকে স্বয়ং তাদের অনুসারীদের হাতেই নির্যাতিতও হতে দেখা গেছে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায়ের অবস্থা তা নয়। তারা একদিকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর প্রতি এমন আনুগত্য ও মহব্বত পোষণ করে যে, এর সামনে জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, ইজ্জত-আবরু সবকিছু বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হয় না। অপরদিকে রসূলকে রসূল এবং আল্লাহ্‌কে আল্লাহ্‌ই মনে করে। এতসব পরাকাষ্ঠা ও শ্রেষ্ঠত্ব সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-কে তারা আল্লাহ্‌র দাস ও রসূল বলেই বিশ্বাস করে এবং মুখে প্রকাশ করে। তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করতে গিয়েও তারা একটা সীমার ভেতরে থাকে।

কর্ম ও এবাদতের ভারসাম্য ঃ বিশ্বাসের পরই শুরু হয় আমল ও এবাদতের পালা। এক্ষেত্রেও পূর্ববর্তী সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা শরীয়তের বিধি-বিধানকে কানাকড়ির বিনিময়ে বিক্রি করে দেয়, ঘুষ-উৎকোচ নিয়ে আসমানী গ্রন্থকে পরিবর্তন করে অথবা মিথ্যা ফতোয়া দেয়, বাহানা ও অপকৌশলের মাধ্যমে ধর্মীয় বিধান পরিবর্তন করে এবং এবাদত থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অপরদিকে তাদের উপাসনালয়সমূহে এমন লোকও দেখা যায়, সংসারধর্ম ত্যাগ করে বৈরাগ্য অবলম্বন করেছে। তারা খোদাপ্রদত্ত হালাল নেয়ামত থেকেও নিজেদের বঞ্চিত রাখে এবং কষ্ট সহ্য করাকেই সওয়াব ও এবাদত বলে মনে করে।

পক্ষান্তরে মুসলিম সম্প্রদায় একদিকে বৈরাগ্যকে মানবতার প্রতি জুলুম বলে মনে করে এবং অপরদিকে আল্লাহ্ ও রসূলের বিধি-বিধানের জন্যে জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না। তারা রোম ও পারস্য সম্রাটের সিংহাসনের অধিপতি ও মালিক হয়েও বিশ্বকে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্মনীতি ও রাজনীতির মধ্যে কোন বৈরিতা নেই এবং ধর্ম মসজিদ ও খানকায় আবদ্ধ থাকার জন্যে আসেনি ; বরং হাট-ঘাট, মাঠ-ময়দান, অফিস-আদালত এবং মন্ত্রণালয়সমূহে এর সাম্রাজ্য অপ্রতিহত। তাঁরা বাদশাহীর মাঝে ফকিরী এবং ফকিরীর মাঝে বাদশাহী শিক্ষা দিয়েছে।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভারসাম্য ঃ এরপর সমাজ ও সংস্কৃতির প্রতি লক্ষ্য করুন। পূর্ববর্তী উম্মতসমূহের মধ্যে একদিকে দেখা যায়, তারা মানবাধিকারের প্রতি পরওয়াও করেনি ; ন্যায়-অন্যায়ের তো কোন কথাই নেই। নিজেদের স্বার্থের বিরুদ্ধে কাউকে যেতে দেখলে তাকে নিপীড়ণ, হত্যা ও লুণ্ঠন করাকেই বড় কৃতিত্ব মনে করেছে। জনৈক বিত্তশালীর চারণভূমিতে অপরের উট প্রবেশ করে কিছু ক্ষতিসাধন করায় সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে শতাব্দীব্যাপী যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যায়। এতে কত মানুষ যে নিহত হয়, তার কোন ইয়ত্তা নেই। মহিলাদের মানবাধিকার দান করা তো দূরের কথা, তাদের জীবিত থাকার অনুমতি পর্যন্ত দেয়া হত না। কোথাও প্রচলিত ছিল শৈশবেই তাদের জীবন্ত সমাহিত করার প্রথা এবং কোথাও মৃত স্বামীর সাথে স্ত্রীকে দাহ করার প্রথা। অপরদিকে এমন নির্বোধ দয়ার্দ্রতারও প্রচলন ছিল যে, পোকা-মাকড় হত্যা করাকেও অবৈধ জ্ঞান করা হত। জীব-হত্যাকে তো দস্তুরমত মহাপাপ বলে সাব্যস্ত করা হত। আল্লাহ্‌র হালাল করা প্রাণীর গোশত ভক্ষণকে মনে করা হত অন্যায়।

কিন্তু মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এসব ভারসাম্যহীনতার অবসান ঘটিয়েছে। তারা একদিকে মানুষের সামনে মানবাধিকারকে তুলে ধরেছে। শুধু শান্তি ও সন্ধির সময়ই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুর অধিকার সংরক্ষণে সচেতনতা শিক্ষা দিয়েছে। অপরদিকে প্রত্যেক কাজের একটা সীমা নির্ধারণ করেছে, যা লঙ্ঘণ করাকে অপরাধ সাব্যস্ত করেছে। নিজ অধিকারের ব্যাপারে ক্ষমা, মার্জনা ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং অপরের অধিকার প্রদানে যত্নবান হওয়ার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

অর্থনৈতিক ভারসাম্য ঃ এরপর অর্থনীতি বিশ্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এক্ষেত্রেও অপরাপর সম্প্রদায়ের মধ্যে বিস্তর ভারসাম্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। একদিকে রয়েছে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা। এতে হালাল-হারাম এবং অপরের সুখ-শান্তি ও দুঃখ-দুরবস্থা থেকে চক্ষু বন্ধ করে অধিকতর ধন-সম্পদ সঞ্চয় করাকেই সর্ববৃহৎ মানবিক সাফল্য গণ্য করা হয়। অপরদিকে রয়েছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। এতে ব্যক্তি মালিকানাকেই অপরাধ সাব্যস্ত করা হয়। চিন্তা করলে বুঝা যায় যে, উভয় অর্থব্যবস্থার সারমর্মই হচ্ছে ধন-সম্পদের উপাসনা, ধন-সম্পদকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও মূল উদ্দেশ্য জ্ঞান করা এবং এরই জন্যে যাবতীয় চেষ্ট-সাধনা নিয়োজিত করা।

মুসলিম সম্প্রদায় ও তাদের শরীয়ত এক্ষেত্রেও ভারসাম্যপূর্ণ অভিনব

অর্থব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। ইসলামী শরীয়ত একদিকে ধন-সম্পদকে জীবনের লক্ষ্য মনে করতে বারণ করেছে এবং সম্মান, ইজ্জত ও কোন পদমর্যাদা লাভকে এর উপর নির্ভরশীল রাখেনি ; অপরদিকে সম্পদ বন্টনের নিষ্কলুষ নীতিমালা প্রণয়ন করে দিয়েছে যাতে কোন মানুষ জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণ থেকে বঞ্চিত না থাকে এবং কেউ সমগ্র সম্পদ কুক্ষিগত করে না বসে। এছাড়া সম্মিলিত মালিকানাভুক্ত বিষয়-সম্পত্তিকে যৌথ ও সাধারণ ওয়াক্‌ফের আওতায় রেখেছে। বিশেষ বস্তুর মধ্যে ব্যক্তিমালিকানার প্রতি সম্মান দেখিয়েছে। হালাল মালের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করেছে এবং তা রাখার ও ব্যবহার করার পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছে।

সাক্ষ্যদানের জন্যে ন্যায়ানুগ হওয়া শর্ত ঃ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ মুসলিম সম্প্রদায়কে ভারসাম্যপূর্ণ তথা ন্যায়ানুগ করা হয়েছে যাতে তারা সাক্ষাদানের যোগ্য হয়। এতে বুঝা যায়, যে ব্যক্তি আদেল বা ন্যায়নুগ নয়, সে সাক্ষ্যদানেরও যোগ্য নয়। আদেলের অর্থ সাধারণতঃ 'নির্ভরযোগ্য' করা হয়। এর সম্পূর্ণ শর্ত ফেকাহ্ গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত রয়েছে।

ইজ্‌মা শরীয়তের দলীল ঃ ইমাম কুরতুবী বলেন, ইজ্‌মা (মুসলিম ঐকমত্য) যে শরীয়তের একটি দলীল, আলোচ্য আয়াতটি তার প্রমাণ। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলা এ সম্প্রদায়কে সাক্ষ্যদাতা সাব্যস্ত করে আপরাপর সম্প্রদায়ের বিপক্ষে তাদের বক্তব্যকে দলীল করে দিয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের ইজমা বা ঐকমত্যও একটি দলীল এবং তা পালন করা ওয়াজিব। সাহাবীগণের ইজমা তাবেয়িগণের জন্যে এবং তাবেয়িগণের ইজমা তাঁদের পরবর্তীদের জন্যে দলীল স্বরূপ।

তফসীরে মাযহারীতে বর্ণিত আছে ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ সম্প্রদায়ের যেসব ক্রিয়াকর্ম সর্বসম্মত, তা আল্লাহ্‌র কাছে প্রশংসনীয় ও গ্রহণীয়। কারণ, যদি মনে করা হয় যে, তারা ভ্রান্ত বিষয়ে একমত হয়েছে, তবে তাদের নির্ভরযোগ্য সম্প্রদায় বলার কোন অর্থ থাকে না।

ইমাম জাস্‌সাস বলেন ঃ এই আয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রত্যেক যুগের মুসলমানদের ইজমাই আল্লাহ্‌র কাছে গ্রহণীয়। 'ইজমা শরীয়তের দলীল' — এ কথাটি প্রথম শতাব্দী অথবা বিশেষ কোন যুগের সাথে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত নয়। কারণ, আয়াতে সমগ্র সম্প্রদায়কেই সম্বোধন করা হয়েছে। যারা আয়াত নাযিলের সময়ে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁরাই শুধু মুসলিম সম্প্রদায় নন ; বরং কিয়ামত পর্যন্ত যত মুসলমান আসবে, তারা সবাই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। সুতরাং প্রতি যুগের মুসলমানই 'আল্লাহ্‌র সাক্ষ্যদাতা'। তাদের উক্তি দলীল। তারা কোন ভুল বিষয়ে একমত হতে পারে না।

কা'বা শরীফ সর্বপ্রথম কখন নামাযের কেবলা হয় ঃ হিজরতের পূর্বে মক্কা মোকাররমায় যখন নামায ফরয হয়, তখন কা'বা গৃহই নামাযের জন্যে কেবলা ছিল, না বায়তুল-মোকাদ্দস ছিল— এ প্রশ্নে সাহাবী ও তাবেয়িগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ ইসলামের শুরু থেকেই কেবলা ছিল বায়তুল-মোকাদ্দাস। হিজরতের পরও ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসই কেবলা ছিল। এরপর কা'বাকে কেবলা করার নির্দেশ আসে। তবে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে হাজরে-আসওয়াদ ও রোকনে-ইয়ামানীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন যাতে কা'বা ও বায়তুল-মোকাদ্দাস উভয়টিই সামনে থাকে। মদীনায় পৌছার পর এরূপ করা সম্ভবপর ছিল না। তাই তাঁর মনে কেবলা পরিবর্তনের বাসনা দানা বাঁধতে থাকে।— (ইবনে-কাসীর)

অন্যান্য সাহাবী ও তাবেয়িগণ বলেন ঃ মক্কায় নামায ফরয হওয়ার সময় কা'বা গৃহই ছিল মুসলমানদের প্রাথমিক কেবলা। কেননা, হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)- এর কেবলাও তাই ছিল। মহানবী (সাঃ) মক্কায় অবস্থানকালে কা'বাগৃহের দিকে মুখ করেই নামায পড়তেন। মদীনায় হিজরতের পর তাঁর কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস সাব্যস্ত হয়। তিনি মদীনায় ষোল/সতের মাস পর্যন্ত বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়েন। এরপর প্রথম কেবলা অর্থাৎ, কা'বাগৃহের দিকে মুখ করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়।

বনু-সালমার মুসলমানরা যোহর অথবা আসরের নামায থেকেই কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশ কার্যকর করে নেন। কিন্তু কেবার মসজিদে এ সংবাদ পরদিন ফজরের নামাযে পৌছালে তারাও নামাযের মধ্যেই বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে কা'বার দিকে মুখ করে নেন।— (ইবনে-কাসীর, জাস্‌সাস্)।

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ – এখানে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ঈমানের প্রচলিত অর্থ নেয়া হলে আয়াতের মর্ম হবে এই যে, কেবলা পরিবর্তনের ফলে নির্বোধেরা মনে করতে থাকে যে, এরা ধর্ম ত্যাগ করেছে কিংবা এদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। উত্তরে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের ঈমান নষ্ট করবেন না। কাজেই তোমরা নির্বোধদের কথায় কর্ণপাত করো না।

কোন কোন হাদীসে এবং মনীষীদের উক্তিতে এখানে ঈমানের অর্থ করা হয়েছে নামায। মর্মার্থ এই যে, সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে মুখ করে যেসব নামায পড়া হয়েছে, আল্লাহ্ তা'আলা সেগুলো নষ্ট করবেন না ; বরং তা শুদ্ধ ও মকবুল হয়েছে।

সহীহ্ বোখারীতে ইবনে-আ'যেব (রাঃ) এবং তিরমিযীতে ইবনে-আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, কা'বাকে কেবলা করার পর অনেকেই প্রশ্ন করে যে, যেসব মুসলমান ইতিমধ্যেই ইন্তেকাল করেছেন, তাঁরা বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিকে নামায পড়ে গেছেন— কা'বার দিকে নামায পড়ার সুযোগ পাননি, তাঁদের কি হকে? এ প্রশ্নের প্রেক্ষিতেই অলোচ্য আয়াত নাযিল হয়। এতে নামাযকে 'ঈমান' শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করে স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, তাদের সব নামাযই শুদ্ধ ও গ্রহণীয়। তাদের ব্যাপারে কেবলা পরিবর্তনের কোন প্রতিক্রিয়া হবে না।

আলোচ্য ১৪৪ তম আয়াতের প্রথম বাক্যে কা'বার প্রতি রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)- এর আকর্ষণ এবং এর বিভিন্ন কারণ বর্ণিত হয়েছে। এসব কারণের মধ্যে কোন বিরোধ নেই — সবই সম্ভবপর। উদাহরণত ঃ মহানবী (সাঃ) ওহী অবতরণ ও নবুওয়ত-প্রাপ্তির পূর্বে স্বীয় স্বভাবগত ঝোঁকে দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুসরণ করতেন। ওহী অবতরণের পর কোরআনও তাঁর শরীয়তকে দ্বীনে-ইবরাহিমীর অনুরূপ বলেই আখ্যা দিয়েছে। হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আঃ)-এর কেবলাও কা'বাই ছিল।

আরও কারণ ছিল এই যে, আরব গোত্রগুলো মৌখিকভাবে হলেও দ্বীনে-ইবরাহীমী স্বীকার করত এবং নিজেদেরকে তার অনুসারী বলে দাবী করত। ফলে কা'বা মুসলমানদের কেবলা হয়ে গেলে তারা ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারত। সাবেক কেবলা বায়তুল-মোকাদ্দাস দ্বারা

আহ্‌লে-কিতাবদের আকৃষ্ট করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ষোল/সতের মাসের অভিজ্ঞতার পর সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়। কারণ, মদীনার ঈহুদীরা এর কারণে ইসলামের নিকটবর্তী হওয়ার পরিবর্তে দূরেই সরে যাচ্ছিল।

মোটকথা, কা'বা মুসলমানদের কেবলা সাব্যস্ত হোক— এটাই ছিল মহানবী (সাঃ)-এর আন্তরিক বাসনা। তবে আল্লাহ্‌র নৈকট্যশীল পয়গম্বরগণ কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করার অনুমতি আছে বলে, না জানা পর্যন্ত আল্লাহ্‌র দরবারে কোন দরখাস্ত ও বাসনা পেশ করেন না। এতে বুঝা যায়, যে, মহানবী (সাঃ) এ দোয়া করার অনুমতি পূর্বাহ্নেই পেয়েছিলেন। এজন্য তিনি কেবলা পরিবর্তনের দোয়া করেছিলেন এবং তা কবুল হবে বলে আশাবাদীও ছিলেন। একারণেই তিনি বারবার আকাশের দিকে চেয়ে দেখতেন যে, ফেরেশতা নির্দেশ নিয়ে আসছে কিনা। আলোচ্য আয়াতে এ দৃশ্যটি বর্ণনা করার পর প্রথমে দেয়া কবুল করার ওয়াদা করা হয়— فَلَنُوَلِّيَنَّكَ অর্থাৎ - আমি আপনার চেহারা-মোবারক সেদিকেই ফিরিয়ে দেব, যেদিকে আপনি পছন্দ করেন। অতঃপর তৎক্ষণাৎ সে দিকে মুখ করার আদেশ নাযিল করা হয়, যথা, فَوَلِّ وَجْهَكَ এর বর্ণনা পদ্ধতিটি বিশেষ আনন্দদায়ক। এতে প্রথমে ওয়াদার আনন্দ ও পরে ওয়াদা পূরণের আনন্দ একই সাথে উপভোগ করা যায়।

নামাযে কেবলামুখী হওয়ার মাসআলা ঃ পূর্বে বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের কাছে সবদিকিই সমান قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ পূর্ব-পশ্চিম আল্লাহ্‌রই মালিকানাধীন। কিন্তু উম্মতের স্বার্থে সারা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যে একটি দিককে কেবলা হিসাবে নির্দিষ্ট করে সবার মাঝে ধর্মীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। তবে এ দিকটি বায়তুল-মোকাদ্দাসও হতে পারত। কিন্তু মহানবী (সাঃ)-এর আন্তরিক বাসনার কারণে কা'বাকে কেবলা সাব্যস্ত করে আলোচ্য আয়াতে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এখানে فول وجهك الى الكعبة অর্থাৎ, 'কা'বার দিকে অথবা বায়তুল্লাহ্‌র দিকে মুখ কর' বলার পরিবর্তে شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (অর্থাৎ মসজিদে হারামের দিকে) বলা হয়েছে। এতে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মাসআলা স্পষ্ট হয়ে গেছে।

প্রথমতঃ যদিও আসল কেবলা বায়তুল্লাহ্ তথা কা'বা; কিন্তু কা'বার দিকে মুখ করা সেখান পর্যন্তই সম্ভব, যেখান থেকে তা দৃষ্টিগোচর হয়। যারা সেখান থেকে দূরে এবং কা'বা তাদের দৃষ্টির আগোচরে থাকে, তাঁদের উপরও হুবহু কা'বার দিকে মুখ করার কড়াকড়ি আরোপ করা হলে, তা পালন করা খুবই কঠিন হতো। বিশেষ যন্ত্রপাতি ও অঙ্কের মাধ্যমেও নির্ভুল দিক নির্ণয় করা দূরবর্তী অঞ্চলসমূহে অনিশ্চিত হয়ে পড়তো। অথচ শরীয়ত সহজ-সরল ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণে বায়তুল্লাহ্ অথবা কা'বা শব্দের পরিবর্তে মসজিদুল-হারাম শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। বায়তুল্লাহ্ অপেক্ষা মসজিদুল হারাম অনেক বেশী স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ বিস্তৃত স্থানের দিকে মুখ করা দূর-দূরান্তের মানুষের জন্যেও সহজ।

সংক্ষিপ্ত শব্দ الى - এর পরিবর্তে شطر শব্দটি ব্যবহার করায় কেবলার দিকে মুখ করার ব্যাপারটি আরও সহজ হয়ে গেছে। شطر দু'অর্থে ব্যবহৃত হয়— বস্তুর অর্ধাংশ ও বস্তুর দিক। আলোচ্য আয়াতে এর অর্থ হচ্ছে বস্তুর দিক। এতে বুঝা যায় যে, দূরবর্তী দেশসমূহে বা অঞ্চলে বিশেষভাবে মসজিদে-হারামের দিকে মুখ করাও জরুরী নয়; বরং মসজিদে-হারাম যেদিকে অবস্থিত সে দিকের প্রতি মুখ করাই যথেষ্ট। — (বাহ্‌রে-মুহীত)

وَمَآ اَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ - আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, খানায়ে-কা'বা কিয়ামত পর্যন্ত আপনার কেলা থাকবে। এতে ইহুদী-নাসারাদের সে মতবাদের খণ্ডন করাই ছিল উদ্দেশ্য যে, মুসলমানদের কেবলার কোন স্থিতি নেই; ইতিপূর্বে তাদের কেবলা ছিল খানায়ে-কা'বা, পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল-মোকাদ্দাস হল,

আবার তাও বদলে গিয়ে পুনরায় খানায়ে-কা'বা হলো। আবারও হয়তো বায়তুল-মোকাদ্দাসকেই কেবলা বানিয়ে নেবে।- (বাহ্‌রে-মুহীত)

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَآءَهُمْ - এখানে অসম্ভবকে সম্ভব ধরে নিয়ে হুযুর (সাঃ)- কে সম্বোধন করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিষয়টির দ্বারা উম্মতে-মুহাম্মদীকে অবহিত করাই উদ্দেশ্য যে, উল্লেখিত নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ এতই কঠিন ব্যাপার যে, স্বয়ং রসূলে-করীম (সাঃ)-ও যদি এমনটি করেন, (অবশ্য তা অসম্ভব), তবে তিনিও সীমা লঙ্ঘনকারী বলে সাব্যস্ত হবেন।

১৪৬ নং আয়াতে রসূলে-করীম (সাঃ)-কে রসূল হিসাবে চেনার উদাহরণ সন্তানদের চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এরা যেমন কোনরকম সন্দেহ-সংশয়হীনভাবে নিজেদের সন্তানদেরকে জানে, তেমনিভাবে তওরাত ও ইঞ্জীলে বর্ণিত রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুসংবাদ, প্রকৃষ্ট লক্ষণ ও নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে তাঁকেও সন্দেহাতীতভাবেই চেনে। কিন্তু তাদের যে অস্বীকৃতি তা একান্তভাবেই হঠকারিতা ও বিদ্বেষপ্রসূত।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, পরিপূর্ণভাবে চেনার উদাহরণ পিতা-মাতাকে চেনার সাথে না দিয়ে সন্তান-সন্ততিকে চেনার সাথে দেয়া হয়েছে। অথচ মানুষ স্বভাবতঃ পিতা-মাতাকেও অত্যন্ত ভাল করেই জানে। এহেন উদাহরণ দেয়ার কারণ হল এই যে, পিতা-মাতার নিকট সন্তানাদির পরিচয় সন্তানের নিকট পিতা-মাতার পরিচয় অপেক্ষা বহুগুণ বেশী হয়ে থাকে। কারণ, পিতা-মাতা জন্মলগ্ন থেকে সন্তান-সন্ততিকে স্বহস্তে লালন-পালন করে। তাদের শরীরের এমন কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেই, যা পিতা-মাতার দৃষ্টির অন্তরালে থাকতে পারে। পক্ষান্তরে পিতা-মাতার গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সন্তানরা কখনও দেখে না।

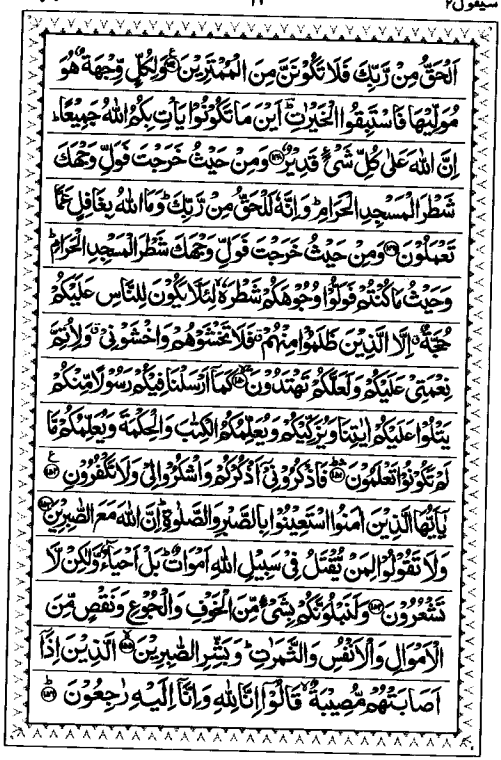

(১৪৭) বাস্তব সত্য সেটাই যা তোমার পালনকর্তা বলেন। কাজেই তুমি সন্দিহান হয়ো না। (১৪৮) আর সবার জন্যই রয়েছে কেবলা একেক দিকে, যে দিকে সে মুখ করে (এবাদত করবে)। কাজেই সৎকাজে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। যেখানেই তোমরা থাকবে, আল্লাহ্ অবশ্যই তোমাদেরকে সমবেত করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব বিষয়ে ক্ষমতাশীল। (১৪৯) আর যে স্থান থেকে তুমি বের হও, নিজের মুখ মসজিদে হারামের দিকে ফেরাও—নিঃসন্দেহে এটাই হলো তোমার পালনকর্তার পক্ষ থেকে নির্ধারিত বাস্তব সত্য। বস্তুতঃ তোমার পালনকর্তা তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অনবহিত নন। (১৫০) আর তোমরা যেখান থেকেই বেরিয়ে আস এবং যেখানেই অবস্থান কর সেদিকেই মুখ ফেরাও, যাতেকরে মানুষের জন্য তোমাদের সাথে ঝগড়া করার অবকাশ না থাকে। অবশ্য যারা অবিবেচক, তাদের কথা আলাদা। কাজেই তাদের আপত্তিতে ভীত হয়ো না। আমাকেই ভয় কর। যাতে আমি তোমাদের জন্যে আমার অনুগ্রহসমূহ পূর্ণ করে দেই এবং তাতে যেন তোমরা সরলপথ প্রাপ্ত হও। (১৫১) যেমন, আমি পাঠিয়েছি তোমাদেরই মধ্য থেকে তোমাদের জন্যে একজন রসূল, যিনি তোমাদের নিকট আমার বাণীসমূহ পাঠ করবেন এবং তোমাদের পবিত্র করবেন ; আর তোমাদের শিক্ষা দেবেন কিতাব ও তাঁর তত্ত্বজ্ঞান এবং শিক্ষা দেবেন এমন বিষয় যা কখনো তোমরা জানতে না। (১৫২) সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদের স্মরণ রাখবো এবং আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর ; অকৃতজ্ঞ হয়ো না। (১৫৩) হে মুমিনগণ ! তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নিশ্চিতই আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হয়, তাদের মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (১৫৫) এবং অবশ্যই আমি তোমাদিগকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও সবরকারীদের— (১৫৬) যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে, নিশ্চয় আমরা সবাই আল্লাহ্র জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই সান্নিধ্যে ফিরে যাবো।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

এ বর্ণনার দ্বারা এ কথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, এখানে সন্তানকে শুধু সন্তান হিসাবে চেনাই উদ্দেশ্য নয়। কারণ, তার পৈতৃক সম্পর্ক ক্ষেত্রবিশেষে সন্দেহজনকও হতে পারে। স্ত্রীর খেয়ানতের দরুন সন্তান তার নিজের নাও হতে পারে। বরং এখানে আকার-অবয়বের পরিচয় জানা হলো উদ্দেশ্য। পুত্র-কন্যা প্রকৃতপক্ষে নিজের হোক বা নাই হোক, কিন্তু মানুষ সন্তান হিসাবে যাকে প্রতিপালন করে, তার আকার-অবয়ব চেনার ব্যাপারে কখনও সন্দেহ হয় না।

আলোচ্য আয়াতে কেবলা পরিবর্তনের বিষয়টি বলতে গিয়ে فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ বাক্যটি তিনবার এবং وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ বাক্যটি দু'বার করে পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। এর একটা সাধারণ কারণ এই যে, কেবলা পরিবর্তনের নির্দেশটি বিরোধীদের জন্য তো এক হৈ-চৈয়ের ব্যাপার ছিলই, স্বয়ং মুসলমানদের জন্যও তাদের এবাদতের ক্ষেত্রে ছিল একটা বৈপ্লবিক ঘটনা। কাজেই এই নির্দেশটি যদি যথার্থ তাকীদ ও গুরুত্ব সহকারে ব্যক্ত করা না হতো, তাহলে মনের প্রশান্তি অর্জন হয়ত যথেষ্ট সহজ হতো না। আর সেজন্যই নির্দেশটিকে বার বার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে। তদুপরি এতে এরূপ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কেবলার এই যে পরিবর্তন, এটাই সর্বশেষ পরিবর্তন। এরপর পুনঃপরিবর্তনের আর কোন সম্ভাবনাই নেই। প্রথমবারের নির্দেশঃ

"অতঃপর তুমি তোমার মুখমণ্ডল মসজিদুল-হারামের দিকে ফেরাও এবং যেখানেই তুমি থাক না কেন, এরপর থেকে তুমি তোমার চেহারা সেদিকেই ফেরাবে",- এ নির্দেশটি মুকীম অবস্থায় থাকার সময়ের। অর্থাৎ, যখন আপনি আপনার স্থায়ী বাসস্থানে অবস্থান করেন, তখন নামাযে মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়াবেন। এরপর সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করে বলা হচ্ছে যে— وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ নিজের দেশে বা সফরে যেখানেই থাক না কেন, নামাযে বায়তুল্লাহর দিকেই মুখ ফেরাবে, এ নির্দেশ শুধু মসজিদে-নববীতে নামায পড়ার বেলাতেই নয়; বরং যেকোন স্থানের লোকেরা নিজ নিজ শহরে যখন নামায পড়বে, তখন তারা মসজিদুল-হারামকেই কেবলা বানিয়ে নামায পড়বে।

এ নির্দেশ দ্বিতীয়বার পুনরুল্লেখ করার পূর্বে وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ অর্থাৎ, "যেখানেই তুমি বের হয়ে যাও না কেন" কথাটা যোগ করে বুঝানো হয়েছে যে, নিজ নিজ বাসস্থানে মুকীম থাকা অবস্থায় যেমন তোমরা মসজিদুল-হারামের দিকে মুখ করে নামায পড়বে, তেমনি কোথাও সফরে বের হলেও নামাযের সময় মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করেই দাঁড়াবে।

তৃতীয়বারের পুনরুল্লেখের যৌক্তিকতা বর্ণনায় এও বলা হয়েছে যে, বিরোধীরা যাতে কথা বলতে না পারে যে, তওরাত এবং ইঞ্জীলে তো বলা হয়েছিল যে, তওরাত এবং ইঞ্জীলে উল্লেখিত নির্দেশসমূহের মধ্যে আখেরী যমানার প্রতিশ্রুত নবীর কেবলা মসজিদুল-হারাম হওয়ার কথা, কিন্তু এ রসূল (সাঃ) কা'বার পরিবর্তে বায়তুল-মোকদ্দাসকে কেবলা করে নামায পড়ছেন কেন?

وَلِكُلٍّ وِّجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا শব্দটিতে وِّجْهَةٌ শব্দটির আভিধানিক অর্থ এমন বস্তু, যার দিকে মুখ করা হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ কেবলা। এক্ষেত্রে হযরত উবাই ইবনে কা'ব—

وِجْهَةٌ –এর স্থলে قِبْلَةٌ ও পড়েছেন বলে বর্ণিত রয়েছে।

তফসীরের ইমামগণের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই,—প্রত্যেক জাতিরই এবাদতের সময় মুখ করার জন্য একটা নির্ধারিত কেবলা চলে আসছে। সে কেবলা আল্লাহ্‌র তরফ হতে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে, অথবা তারা নিজেরাই তা নির্ধারণ করে নিয়েছে। মোটকথা, এবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেক জাতিই কোন না কোন দিকে মুখ করে দাঁড়ায়। এমতাবস্থায় আখেরী নবীর উম্মতগণের জন্য যদি কোন একটা বিশেষ দিককে কেবলা নির্ধারণ করে দেয়া হয়ে থাকে, তবে তাতে আশ্চর্যান্বিত হওয়ার কি আছে?

এ পর্যন্ত কেবলা পরিবর্তনসংক্রান্ত আলোচনা চলে আসছিল। এখানে বিষয়টিকে এমন এক পর্যায়ে এনে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে এ বিষয়টির ভূমিকায় কা'বা নির্মাতা হযরত ইবরাহীমের দোয়ার বিষয়টিও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচিত হয়ে গেছে। অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম (আঃ)–এর বংশধরদের মধ্যে এক বিশেষ মর্যাদায় মহানবী (সাঃ)–এর আর্বিভাব। এতে এ বিষয়েও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ)–এর আর্বিভাবে কা'বা নির্মাতার দোয়ারও একটা প্রভাব রয়েছে। কাজেই তাঁর কেবলা যদি কা'বা শরীফকে সাব্যস্ত করা হয়, তাহলে তাতে বিস্ময়ের কিংবা অস্বীকারের কিছুই নেই।

كَمَآ أَرْسَلْنَا —বাক্যে উদাহরণসূচক যে, 'কাফ' (ك) বর্ণটি ব্যবহার করা হয়েছে, তার একটি ব্যাখ্যা তো উল্লেখিত তফসীরের মাধ্যমেই বুঝা গেছে। এছাড়াও আরেকটি বিশ্লেষণ রয়েছে, যা কুরতুবী গ্রহণ করেছেন। তা হল এই যে, 'কাফ'–এর সম্পর্ক হল পরবর্তী আয়াত فَاذْكُرُوْنِيْ – এর সাথে। অর্থাৎ, আমি যেমন তোমাদের প্রতি কেবলাকে একটি নেয়ামত হিসাবে দান করেছি এবং অতঃপর দ্বিতীয় নেয়ামত দিয়েছি রসূলের আবির্ভাবের মাধ্যমে, তেমনি আল্লাহ্‌র যিকিরও আরেকটি নেয়ামত। এসব নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় কর, যাতে এসব নেয়ামতের অধিকতর প্রবৃদ্ধি হতে পারে। কুরতুবী বলেন, এখানে كَمَآ أَرْسَلْنَا —এর 'কাফ'টির ব্যবহার ঠিক তেমনি, যেমনটি সূরা আনফালের كما اخرجنا এবং সূরা হেজরের كَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِيْنَ —এর মধ্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

فَاذْكُرُوْنِيْٓ أَذْكُرْكُمْ —এতে 'যিকির'– এর অর্থ হল স্মরণ করা, যার সম্পর্ক হল অন্তরের সাথে। তবে জিহ্বা যেহেতু অন্তরের মুখপাত্র, কাজেই মুখে স্মরণ করাকেও 'যিকির' বলা যায়। এতে বুঝা যায় যে, সে মৌখিক যিকিরই গ্রহণযোগ্য, যার সাথে মনেও আল্লাহ্‌র স্মরণ বিদ্যমান থাকবে।

তবে এতদসঙ্গে একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে, কোন লোক যদি মুখে তসবীহ্ জপে ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার মন যদি অনুপস্থিত থাকে অর্থাৎ, যিকিরে না লাগে, তবুও তা একেবারে ফায়দাহীন নয়। হযরত আবু ওসমান (রাহঃ)–এর কাছে জনৈক ভক্ত এমনি অবস্থায় অভিযোগ করেছিল যে, মুখে মুখে যিকির করি বটে, কিন্তু অন্তরে তার কোনই মাধুর্য অনুভব করতে পারি না। তখন তিনি বললেন, —তবুও আল্লাহ্‌র শুকরিয়া আদায় কর যে, তিনি তোমার একটি অঙ্গ জিহ্‌বাকে তো অন্ততঃ তাঁর যিকিরে নিয়োজিত করেছেন।— (কুরতুবী)

যিকিরের ফযীলত ঃ যিকিরের ফযীলত অসংখ্য। তন্মধ্যে এটাও কম ফযীলত নয় যে, বান্দা যদি আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তাহলে আল্লাহ্ তাকে স্মরণ করেন। আবু ওসমান মাহ্‌দী (রহঃ) বলেছেন যে, আমি সে সময়টির কথা জানি, যখন আল্লাহ্ তা'আলা আমাদিগকে স্মরণ করেন। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞেস করল, আপনি তা কেমন করে জানতে পারেন? বললেন, তা এজন্যে যে, কোরআন করীমের ওয়াদা অনুসারে যখন কোন মুমিন বান্দা আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে, তখন আল্লাহ্ নিজেও তাকে স্মরণ করেন। কাজেই বিষয়টি জানা সবার জন্যই সহজ যে, আমরা যখন আল্লাহ্‌র স্মরণে আত্মনিয়োগ করব, আল্লাহ্ তা'আলাও আমাদের স্মরণ করবেন।

আর আয়াতের অর্থ হল এই যে, তোমরা যদি আমাকে আমার হুকুমের আনুগত্যের মাধ্যমে স্মরণ কর, তাহলে আমিও তোমাদেরকে সওয়াব ও মাগফেরাত দানের মাধ্যমে স্মরণ করব।

হযরত সায়ীদ ইবনে জুবাইর (রঃ) 'যিকরুল্লাহ্'র তফসীর প্রসঙ্গে বলেছেন যে, যিকিরের অর্থই হচ্ছে আনুগত্য এবং নির্দেশ মান্য করা। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশের আনুগত্য করে না, সে আল্লাহ্‌র যিকিরই করে না; প্রকাশ্যে যত বেশী নামায এবং তসবীহ্‌ই সে পাঠ করুক না কেন।"

যিকিরের তাৎপর্য ঃ মুফাস্‌সের কুরতুবী ইবনে–খোয়াইয–এর আহ্‌কামুল কোরআনের বরাত দিয়ে এ সম্পর্কিত একখানা হাদীসও উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটির মর্মার্থ হচ্ছে যে, রসূল (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করে অর্থাৎ, তাঁর হালাল ও হারাম সম্পর্কিত নির্দেশগুলোর অনুসরণ করে, যদি তার নফল নামায–রোযা কিছু কমও হয়, সেই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে। অন্যদিকে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, সে নামায–রোয, তসবীহ্–তাহলীল প্রভৃতি বেশী করে করলেও প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে না।

হযরত যুন্নূন মিসরী বলেন ঃ "যে ব্যক্তি প্রকৃতই আল্লাহ্‌কে স্মরণ করে সে অন্যান্য সব কিছুই ভুলে যায়। এর বদলায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলাই সবদিক দিয়ে তাকে হেফাযত করেন এবং সব কিছুর বদলা তাকে দিয়ে দেন।"

হযরত মু'আয (রাঃ) বলেন ঃ "আল্লাহ্‌র আযাব থেকে মুক্ত করার ব্যাপারে মানুষের কোন আমলই যিকরুল্লাহ্‌র সমান নয়।" হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে–কুদ্‌সীতে আছে, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন,— "বান্দা যে পর্যন্ত আমাকে স্মরণ করতে থাকে বা আমার স্মরণে যে পর্যন্ত তার ঠোঁট নড়তে থাকে, সে পর্যন্ত আমি তার সাথে থাকি।

ধৈর্য ও নামায যাবতীয় সংকটের প্রতিকার ঃ اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ "ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর," — এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, মানুষের দুঃখ–কষ্ট, যাবতীয় প্রয়োজন ও সমস্ত সংকটের নিশ্চিত প্রতিকার দু'টি বিষয়ের মধ্যেই নিহিত। একটি 'সবর' বা ধৈর্য এবং অন্যটি "নামায"। বর্ণনারীতির মধ্যে اسْتَعِيْنُوْا শব্দটিকে বিশেষ কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট না করে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করার ফলে এখানে যে মর্মার্থ দাঁড়ায় তা এই যে, মানব জাতির যে কোন সংকট বা সমস্যার নিশ্চিত প্রতিকারই ধৈর্য ও নামায। যে কোন প্রয়োজনেই এ দু'টি বিষয়ের দ্বারা মানুষ সাহায্য লাভ করতে পারে। তফসীরে মাযহারীতে শব্দ দু'টির ব্যাপক অর্থে ব্যবহারের তাৎপর্য এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ স্বতন্ত্রভাবে দু'টি বিষয়েরই তাৎপর্য অনুধাবন করা যেতে পারে।

সবর–এর তাৎপর্য ঃ 'সবর' শব্দের অর্থ হচ্ছে সংযম অবলম্বন ও

নফস্-এর উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ।

কোরআন ও হাদীসের পরিভাষায় 'সবর'-এর তিনটি শাখা রয়েছে। (এক) নফসকে হারাম এবং না-জায়েয বিষয়াদি থেকে বিরত রাখা (দুই) এবাদত ও আনুগত্যে বাধ্য করা এবং (তিন) যে কোন বিপদ ও সংকটে ধৈর্যধারণ করা। অর্থাৎ, যে সব বিপদ-আপদ এসে উপস্থিত হয় সেগুলোকে আল্লাহ্র বিধান বলে মেনে নেয়া এবং এর বিনিময়ে আল্লাহ্র তরফ থেকে প্রতিদান প্রাপ্তির আশা রাখা। অবশ্য কষ্টে পড়ে যদি মুখ থেকে কোন কাতর শব্দ উচ্চারিত হয়ে যায়, কিংবা অন্যের কাছে তা প্রকাশ করা হয়, তবে, তা 'সবর'-এর পরিপন্থী নয়। -(ইবনে কাসীর, সায়ীদ ইবনে জুবায়ের থেকে)।

'সবর'-এর উপরোক্ত তিনটি শাখাই প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। সাধারণ মানুষের ধারণায় সাধারণতঃ তৃতীয় শাখাকেই সবর হিসাবে গণ্য করা হয়। প্রথম দু'টি শাখা যে এক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ, সে ব্যাপারে মোটেও লক্ষ্য করা হয় না। এমনকি এ দু'টি বিষয়ও যে 'সবর'- এর অন্তর্ভুক্ত এ ধারণাও যেন অনেকের নেই। কোরআন-হাদীসের পরিভাষায় ধৈর্যধারণকারী বা 'সাবের' সে সমস্ত লোককেই বলা হয়, যারা উপরোক্ত তিন প্রকারেই 'সবর' অবলম্বন করে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হাশরের ময়দানে ঘোষণা করা হবে, "ধৈর্যধারণকারীরা কোথায়?" একথা শোনার সংগে সংগে সেসব লোক উঠে দাঁড়াবে, যারা তিন প্রকারেই সবর করে জীবন অতিবাহিত করে গেছেন। এসব লোককে প্রথমেই বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করার অনুমতি দেয়া হবে। 'ইবনে-কাসীর' এ বর্ণনা উদ্ধৃত করে মন্তব্য করেছেন যে, কোরআনের অন্যত্র —

إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

অর্থাৎ, সবরকারী বান্দাগণকে তাদের পুস্কার বিনা হিসাবে প্রদান করা হবে— এ আয়াতে সেদিকেই ইশারা করা হয়েছে।

নামায ঃ মানুষের যাবতীয় সমস্যা ও সংকট দূর করা এবং যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে দ্বিতীয় পন্থাটি হচ্ছে নামায।

'সবর'-এর তফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, প্রকৃতপক্ষে সর্বপ্রকার এবাদতই সবরের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু এরপরেও নামাযকে পৃথকভাবে উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে যে, নামায এমনই একটি এবাদত, যাতে 'সবর' তথা ধৈর্যের পরিপূর্ণ নমুনা বিদ্যমান। কেননা, নামাযের মধ্যে একাধারে যেমন নফস তথা রিপুকে আনুগত্যে বাধ্য রাখা হয়, তেমনি যাবতীয় নিষিদ্ধ কাজ, নিষিদ্ধ চিন্তা এমনকি অনেক হালাল ও মোবাহ বিষয় থেকেও সরিয়ে রাখা হয়। সেমতে নিজের 'নফস'-এর উপর পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে সর্বপ্রকার গোনাহ্ ও অশোভন আচার-আচরণ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে হলেও নিজেকে আল্লাহ্র এবাদতে নিয়োজিত রাখার মাধ্যমে 'সবর'-এর যে অনুশীলন করতে হয়, নামাযের মধ্যেই তার একটা পরিপূর্ণ নমুনা ফুটে উঠে।

যাবতীয় প্রয়োজন পূর্ণ করা এবং সর্বপ্রকার বিপদাপদ থেকে মুক্তিলাভ করার ব্যাপারে নামাযের একটা বিশেষ 'তাছীর' বা প্রভাবও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ বিশেষ রোগে কোন কোন অষুধী গুল্ম-লতা ও ডাল-শিকড় গলায় ধারণ করায় বা মুখে রাখায় যেমন বিশেষ ফল লক্ষ্য করা যায়, লোহার প্রতি চুম্বকের বিশেষ আকর্ষণ যেমন স্বাভাবিক, কিন্তু কেন এরূপ হয়, তা যেমন সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে বলা যায় না, তেমনি বিপদ মুক্তি এবং যাবতীয় প্রয়োজন মিটানোর ক্ষেত্রে নামাযের তাছীরও ব্যাখ্যা করা যায় না। তবে এটা পরীক্ষিত সত্য যে, যথাযথ আন্তরিকতা ও মনোযোগ সহকারে নামায আদায় করলে যেমন বিপদমুক্তি অবধারিত, তেমনি যেকোন প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারেও এতে সুনিশ্চিত ফল লাভ হয়।

হুযুর (সাঃ)-এর পবিত্র অভ্যাস ছিল যে, যখনই তিনি কোন কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হতেন, তখনই নামায আরম্ভ করতেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা সে নামাযের বরকতেই তাঁর যাবতীয় বিপদাপদ দূর করে দিতেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে—

اذا حزبه امر فزع الى الصلوٰة

অর্থাৎ, মহানবী (সাঃ)-কে যখনই কোন বিষয় চিন্তিত করে তুলত, তখনই তিনি নামায পড়তে শুরু করতেন।

আল্লাহ্র সান্নিধ্য ঃ নামায এবং 'সবরে'র মাধ্যমে যাবতীয় সংকটের প্রতিকার হওয়ার কারণ এই যে, এ দু'পন্থায়ই আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত সান্নিধ্য লাভ হয়। إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ বাক্যের দ্বারা এদিকে ইশারা করা হয়েছে যে, নামাযী এবং সবরকারিগণের সাথে আল্লাহ্র সান্নিধ্য তথা খোদায়ী শক্তির সমাবেশ ঘটে। যেখানে বা যে অবস্থায় বান্দার সাথে আল্লাহ্র শক্তির সমাবেশ ঘটে, সেখানে দুনিয়ার কোন শক্তি কিংবা কোন সংকটই যে টিকতে পারে না, তা বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন করে না। বান্দা যখন আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান হয়, তখন তার গতি অপ্রতিরোধ্য হয়ে যায়। তার অগ্রগমন ব্যাহত করার মত শক্তি কারও থাকে না। বলাবাহুল্য, মকসুদ হাসিল করা এবং সংকট উত্তরণের নিশ্চিত উপায় একমাত্র আল্লাহ্র শক্তিতে শক্তিমান হওয়াই হতে পারে।

আলমে-বরযখে নবী এবং শহীদগণের হায়াত ঃ ইসলামী রেওয়ায়েত মোতাবেক প্রত্যেক মৃতব্যক্তি আলমে-বরযখে বিশেষ ধরনের এক হায়াত বা জীবন প্রাপ্ত হয় এবং সে জীবনে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কবরের আযাব বা সওয়াব অনুভব করে থাকে। এই জীবন-প্রাপ্তির ব্যাপারে মুমিন-কাফের এবং পুণ্যবান ও গোনাহগারের কোন পার্থক্য নেই। তবে বরযখের এ জীবনের বিভিন্ন স্তর রয়েছে। এক স্তরে সর্বশ্রেণীর লোকই সমানভাবে শরীক। কিন্তু বিশেষ এক স্তর নবী-রসূল এবং বিশেষ নেক্কার বান্দাদের জন্য নির্ধারিত। এ স্তরেও অবশ্য বিশেষ পার্থক্য এবং পরস্পরের বৈশিষ্ট্য রয়েছে।

যেসব লোক আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হন তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা, মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তাহল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশী অনুভূতি দেয়া হয়। যেমন, মানুষের পায়ের গোঁড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ, উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোঁড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনভূতি অনেক বেশী তীক্ষ্ণ। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশী অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদের এ জীবনানুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌঁছে

থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত বলা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাঁদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিসগণের মধ্যে বন্টিত হয়, তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনর্বিবাহ করতে পারে।

এ আয়াতের ক্ষেত্রে নবী-রসূলগণ শহীদগণের চাইতেও অনেক বেশী মর্তবার অধিকারী হয়ে থাকেন। তাঁদের পবিত্র দেহ সম্পূর্ণ অবিকৃত অবস্থায় থাকার পরও বাহ্যিক হুকুম, আহ্কামে তার কিছু প্রভাব অবশিষ্ট থাকে। যথা, তাঁদের পরিত্যক্ত কোন সম্পদ বন্টন করার রীতি নেই। তাঁদের স্ত্রিগণ দ্বিতীয়বার বিবাহ বন্ধনেও আবদ্ধ হতে পারেন না।

মোটকথা, বরযখের এ জীবনে সর্বাপেক্ষা শক্তিসম্পন্ন হচ্ছেন নবী-রসূলগণ, অতঃপর শহীদগণ এবং তারপর অন্যান্য সাধারণ মৃত ব্যক্তিবর্গ। অবশ্য কোন কোন হাদীসের দ্বারা জানা যায় যে, ওলী-আওলিয়া এবং নেক্কার বান্দাগণের অনেকেই বরযখের হায়াতের ক্ষেত্রে শহীদগণের সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে থাকেন। কেননা, আত্মশুদ্ধির সাধনায় রত অবস্থায় যাঁরা মৃত্যুবরণ করেন, তাঁদের মৃত্যুকেও শহীদের মৃত্যু বলা যায়। ফলে তাঁরাও শহীদগণেরই পর্যায়ভুক্ত হয়ে যান। আয়াতের মর্মার্থ অনুযায়ী নিঃসন্দেহে অন্যান্য নেক্কার সালেহগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশী।

যদি কোন শহীদের লাশ মাটিতে বিনষ্ট হতে দেখা যায়, তাহলে এমন ধারণা করা যেতে পারে যে, আল্লাহ্র পথে সে নিহত হয়েছে সত্য, তবে হয় তো নিয়ত বিশুদ্ধ না থাকায় তার সে মৃত্যু যথার্থ শহীদের মৃত্যু হয়নি। কিন্তু এমন কোন শহীদের লাশ যদি মাটির নীচে বিনষ্ট অবস্থায় পাওয়া যায়, আল্লাহ্র পথে শহীদ হওয়ার ব্যাপারে যার নিষ্ঠায় কোন সন্দেহ নেই, তবে সেক্ষেত্রে অবশ্য এমন ধারণা করা উচিত হবে না যে, তিনি শহীদ নন অথবা কোরআনের আয়াতের মর্মার্থ এখানে টিকছে না। কেননা, মানুষের লাশ যে কেবলমাত্র মাটিতেই বিনষ্ট হয় তাই নয়। অনেক সময় ভূমিস্থ অন্যান্য ধাতু কিংবা অন্য কোন কিছুর প্রভাবেও জড়দেহ বিনষ্ট হওয়া সম্ভব। নবী-রসূল ও শহীদগণের লাশ মাটিতে ভক্ষণ করে না বলে হাদীসে যে বর্ণনা রয়েছে, তাতে একথা বুঝা যায় না যে, মাটি ছাড়া তাদের লাশ অন্য কোন ধাতু কিংবা রাসায়নিক প্রভাবেও বিনষ্ট হতে পারে না।

নবী-রসূলগণের পবিত্র দেহও যে সাধারণ মানব-দেহের মত বিভিন্ন উপকরণের দ্বারাই সৃষ্টি হয়েছে একথার প্রমাণ পাওয়া যায়। সুতরাং তাঁদের দেহও অস্ত্রের আঘাত কিংবা ওষুধের প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই প্রভাবান্বিত হয়েছে। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার যে, নবী-রসূলগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবনের তুলনায় শহীদগণের মৃত্যু পূর্ববর্তী জীবন বেশী শক্তিসম্পন্ন হতে পারে না। নবী-রসূলগণের জীবিত দেহে অস্ত্র এবং অন্যান্য ক্ষতিকর উপাদানের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার নির্ভরযোগ্য প্রমাণ রয়েছে। সুতরাং মাটির সাথে মিশ্রিত অন্য কোন রাসায়নিক পদার্থ কিংবা অন্য কোন উপাদানের প্রভাবে যদি শহীদের লাশে কোন প্রকার বিকৃতি ঘটে যায়, তবে এর দ্বারা 'মাটি শহীদের লাশে বিকৃতি ঘটাতে পারে না'— এ হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না।

সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদের লাশ অধিককাল পর্যন্ত মাটির দ্বারা প্রভাবান্বিত না হওয়াকে তাদের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম দু'অবস্থাতেই হতে পারে। প্রথমতঃ চিরকাল জড়দেহ অবিকৃত থাকার মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ অন্যান্যের তুলনায় অনেক বেশীদিন অবিকৃত থাকার মাধ্যমে। যদি বলা হয় যে, তাঁদের দেহও সাধারণ লোকের দেহের তুলনায় আশ্চর্যজনকভাবে বেশীদিন অবিকৃত থাকে এবং হাদীসের দ্বারা একথাই বুঝানো হয়েছে; তবে তাও অবাস্তব হবে না। যেহেতু বরযখের অবস্থা মানুষের সাধারণ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে অনুভব করা যায় না, সেহেতু কোরআনে শহীদের সে জীবন সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ (তোমরা বুঝতে পার না,) বলা হয়েছে। এর মর্মার্থ হল এই যে, সে জীবন সম্পর্কে অনুভব করার মত অনুভূতি তোমাদের দেয়া হয়নি।

বিপদে ধৈর্যধারণ ঃ আল্লাহ্ তা'আলার তরফ থেকে বান্দাদের যে পরীক্ষা নেয়া হয়, তার তাৎপয وَاِذِ ابْتَلٰٓى اِبْرٰهٖمَ رَبُّهٗ আয়াতের তফসীরে বর্ণিত হয়েছে। কোন বিপদে পতিত হওয়ার আগেই যদি সে সম্পর্কে সংবাদ দিয়ে দেয়া হয়, তবে সে বিপদে ধৈর্যধারণ সহজতর হয়ে যায়। কেননা, হঠাৎ করে বিপদ এসে পড়লে পেরেশানী অনেক বেশী হয়। যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলা সমগ্র উম্মতকে লক্ষ্য করেই পরীক্ষার কথা বলেছেন, সেহেতু সবার পক্ষেই অনুধাবন করা উচিত যে, এ দুনিয়া দুঃখ-কষ্ট সহ্য করারই স্থান। সুতরাং এখানে যেসব সম্ভাব্য বিপদ-আপদের কথা বলা হয়েছে, সেগুলোকে অপ্রত্যাশিত কিছু মনে না করলেই ধৈর্যধারণ করা সহজ হতে পারে। পরীক্ষায় সমগ্র উম্মত সমষ্টিগতভাবে উত্তীর্ণ হলে পর সমষ্টিগতভাবেই তার পুরস্কার দেয়া হবে; এছাড়াও সবরের পরীক্ষায় ব্যক্তিগত পর্যায়ে যারা যতটুকু উত্তীর্ণ হবেন, তাদের ততটুকু বিশেষ মর্যাদাও প্রদান করা হবে।

বিপদে 'ইন্না লিল্লাহ্' পাঠ করা ঃ আয়াতে সবরকারিগণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা বিপদের সম্মুখীন হলে— 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' পাঠ করে। এর দ্বারা প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে যে, কেউ বিপদে পড়লে যেন এ দোয়াটি পাঠ করে। কেননা, এরূপ বলাতে একাধারে যেমন অসীম সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তেমনি যদি অর্থের প্রতি যথাযথ লক্ষ্য রেখে পাঠ করা হয়, তবে বিপদে আন্তরিক শান্তিলাভ এবং তা থেকে উত্তরণও সহজতর হয়ে যায়।

(১৫৭) তারা সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই হেদায়েতপ্রাপ্ত। (১৫৮) নিঃসন্দেহে 'সাফা' ও 'মারওয়া' আল্লাহ্ তা'আলার নিদর্শনগুলোর অন্যতম। সুতরাং যারা কা'বা ঘরে হজ্ব বা ওমরাহ পালন করে, তাদের পক্ষে এ দু'টিতে প্রদক্ষিণ করাতে কোন দোষ নেই। বরং কেউ যদি স্বেচ্ছায় কিছু নেকীর কাজ করে, তবে আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই তা অবগত হবেন এবং তার সে আমলের সঠিক মূল্য দেবেন। (১৫৯) নিশ্চয় যারা গোপন করে, আমি যেসব বিস্তারিত তথ্য এবং হেদায়েতের কথা নাযিল করেছি মানুষের জন্য, কিতাবের মধ্যে বিস্তারিত বর্ণনা করার পরও ; সে সমস্ত লোকের প্রতিই আল্লাহ্র অভিসম্পাত এবং অন্যান্য অভিসম্পাতকারীগণেরও। (১৬০) তবে যারা তওবা করে এবং বর্ণিত তথ্যাদির সংশোধণ করে মানুষের কাছে তা বর্ণনা করে দেয়, সে সমস্ত লোকের তওবা আমি কবুল করি এবং আমি তওবা কবুলকারী পরম দয়ালু। (১৬১) নিশ্চয় যারা কুফরী করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে, সে সমস্ত লোকের প্রতি আল্লাহ্র ফেরেশতাগণের এবং সমগ্র মানুষের লা'নত। (১৬২) এরা চিরকাল এ লা'নতের মাঝেই থাকবে। তাদের উপর থেকে আযাব কখনও হালকা করা হবে না এবং এরা বিরামও পাবে না। (১৬৩) আর তোমাদের উপাস্য, একইমাত্র উপাস্য। তিনি ছাড়া মহা করুণাময় দয়ালু কেউ নেই (১৬৪) নিশ্চয়ই আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে এবং নদীতে নৌকাসমূহের চলাচলে মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে। আর আল্লাহ্ তা'আলা আকাশ থেকে যে পানি নাযিল করেছেন, তদ্দ্বারা মৃত যমীনকে সজীব করে তুলেছেন এবং তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সবরকম জীব-জন্তু। আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালায় যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও যমীনের মাঝে বিচরণ করে— নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।

সাফা মারওয়া দৌড়ানো ঃ

'সাফা' এবং 'মারওয়া' বায়তুল্লাহর নিকটবর্তী দু'টি পাহাড়ের নাম। হজ্ব কিংবা ওমরার সময় কা'বা ঘর তওয়াফ করার পর এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে দৌড়াতে হয়। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'সায়ী'। জাহেলিয়াত যুগেও যেহেতু এ সায়ীর রীতি প্রচলিত ছিল এবং তখন এ দু'টি পাহাড়ের মধ্যে কয়েকটি মূর্তি সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এজন্য মুসলমানদের কারো কারো মনে একটা দ্বিধার ভাব জাগ্রত হয়েছিলো যে, বোধহয় এ 'সায়ী' জাহেলিয়াত যুগের কোন অনুষ্ঠান এবং ইসলাম যুগে এর অনুসরণ করা হয় তো গোনাহ্র কাজ।

কোন কোন লোক যেহেতু জাহেলিয়াত যুগে একে একটা অর্থহীন কুসংস্কার বলে মনে করতেন, সেজন্য ইসলাম গ্রহণের পরও তাঁরা একে জাহেলিয়াত যুগের কুসংস্কার হিসেবেই গণ্য করতে থাকেন। এরূপ সন্দেহের নিরসনকল্পে আল্লাহ্ পাক যেভাবে বায়তুল্লাহ্ শরীফের কেবলা হওয়া সম্পর্কিত সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবসান ঘটিয়েছেন, তেমনিভাবে পরবর্তী আয়াতে বায়তুল্লাহ্ সংশ্লিষ্ট আরো একটি সংশয়ের অপনোদন করে দিয়েছেন।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ شَعَآئِرِ اللّٰهِ —এখানে شَعَآئِر শব্দটি شعيرة শব্দের বহুবচন। এর অর্থ চিহ্ন বা নির্দশন। شَعَآئِرِ اللّٰهِ – বলতে সেসব আমলকে বুঝায়, যেগুলোকে আল্লাহ্ তা'আলা দ্বীনের নিদর্শন হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

حج – এর শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য স্থির করা। কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় বায়তুল্লাহ শরীফের উদ্দেশে গমন এবং সেখানে বিশেষ সময়ে বিশেষ ধরনের কিছু কর্ম সম্পাদন করাকে বলা হয় হজ্ব।

عمرة শব্দের আভিধানিক অর্থ দর্শন করা। শরীয়তের পরিভাষায়, বায়তুল্লাহ্ শরীফে হাযির হয়ে তওয়াফ-সায়ী প্রভৃতি বিশেষ ধরনের কয়েকটি এবাদত সম্পাদন করার নামই ওমরা।

'সায়ী' ওয়াজিব ঃ হজ্ব, ওমরা এবং সায়ীর বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে আলোচিত হয়েছে।

সায়ী' করা ইমাম আহমদ (রঃ)-এর মতে সুন্নত, ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর মতে ফরয, ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে ওয়াজিব। যদি কোন কারণে তা ছুটে যায়, তবে একটা ছাগল জবাই করে ফাফ্ফারা দিতে হবে।

উপরোক্ত আয়াতের শব্দবিন্যাস থেকে এরূপ ধারণা করা ঠিক হবে না যে, আয়াতে তো 'সাফা এবং মারওয়ার মধ্যে সায়ী করাতে গোনাহ্ হবে না' বলা হয়েছে। এর দ্বারা বড়জোর এটা একটা মোস্তাহাব কাজ বলে সাব্যস্ত হতে পারে, ওয়াজিব হওয়ার কারণ কি ?

এখানে বুঝা দরকার যে, فَلَاجُنَاحَ (অর্থাৎ, গোনাহ হবে না) কথাটা প্রশ্নের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে বলা হয়েছে। কেননা, প্রশ্ন ছিল, যেহেতু সাফা ও মারওয়াতে মূর্তি স্থাপিত হয়েছিল এবং জাহেলিয়াত যুগের লোকেরা সায়ীর মাধ্যমে সে মূর্তিরই পূজা-অর্চনা করতো, সেহেতু এ কাজটি হারাম হওয়া উচিত। এরূপ প্রশ্নের জবাবেই বলা হয়েছে যে, এতে কোন গোনাহ নেই। আর যেহেতু এটা হযরত ইবরাহীমের প্রবর্তিত সুন্নত, কাজেই কারো কোন বর্বরসুলভ আমল দ্বারা এটা গোনাহ্র কাজ বলে

সাব্যস্ত হতে পারে না। প্রশ্নের জবাবে এরূপ বলাতে এ আমলটি ওয়াজিব হওয়ার পরিপন্থী বুঝা যায় না।

এলমে-দ্বীনের প্রকাশ ও প্রচার করা ওয়াজিব এবং গোপন করা হারাম ঃ উল্লেখিত আয়াতে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্‌র যে সমস্ত প্রকৃষ্ট হেদায়েত অবতীর্ণ হয়েছে, সেগুলো মানুষের কাছে গোপন করা এত কঠিন হারাম ও মহাপাপ, যার জন্য আল্লাহ্ তা'আলা নিজেও লা'নত বা অভিসম্পাত করে থাকেন এবং সমগ্র সৃষ্টিও অভিসম্পাত করে। এতে কয়েকটি বিষয় জানা যায় ঃ

প্রথমতঃ যে জ্ঞানের প্রচার ও প্রসার বিশেষ জরুরী, তা গোপন করা হারাম। রসূলে-করীম (সাঃ) এরশাদ করেছেন— 'যে লোক দ্বীনের কোন বিধানের বিষয় জানা সত্ত্বেও তা জিজ্ঞেস করলে গোপন করবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দেবেন।' – হাদীসটি হযরত আবু-হোরায়রা ও আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে ইবনে মাজা রেওয়ায়েত করেছেন।

ফেকাহ্‌বিদগণ বলেছেন, এ অভিসম্পাত আরোপিত হবে তখনই, যখন অন্য কোন লোক সেখানে উপস্থিত থাকবে না। যদি অন্যান্য আলেম লোকও সেখানে উপস্থিত থাকেন, তবে একথা বলে দেয়া যেতে পারে যে, অন্য কোন আলেমকে জিজ্ঞেস করে নাও।—(কুরতুবী, জাস্‌সাস)

দ্বিতীয়তঃ জানা যায় যে, 'জ্ঞানকে গোপন করার' অভিসম্পাত সে সমস্ত জ্ঞান ও মাসআলা গোপন করার ব্যাপারেই প্রযোজ্য, যা কোরআন ও সুন্নাহ্‌তে পরিস্কারভাবে উল্লেখ রয়েছে এবং যার প্রকাশ ও প্রচার করা কর্তব্য। পক্ষান্তরে এমন সুক্ষ্ম ও জটিল মাসআলা সাধারণ্যে প্রকাশ না করাই উত্তম, যদ্দারা সাধারণ লোকদের মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি ও বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। তখন তা كتمان علم বা জ্ঞানকে গোপন করার হুকুমের আওতায় পড়বে না। উল্লেখিত আয়াতে مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى বাক্যের দ্বারাও তেমনি ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তেমনিভাবে মাসআলা-মাসায়েল সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন, 'তোমরা যদি সাধারণ মানুষকে এমনসব হাদীস শোনাও যা তারা পরিপূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না, তবে তাদেরকে ফেতনা-ফাসাদেরই সম্মুখীন করবে।—(কুরতুবী)

সহীহ্ বোখারীতে হযরত আলী (রাঃ) থেকে উদ্ধৃত রয়েছে, তিনি বলেছেন যে,— 'সাধারণ মানুষের সামনে এলেমের শুধুমাত্র ততটুকু প্রকাশ করবে, যতটুকু তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ধারণ করতে পারে। মানুষ আল্লাহ্ ও রসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করুক; তোমরা কি এমন কামনা কর? কারণ, যেকথা তাদের বোধগম্য নয়, তাতে তাদের মনে নানারকম সন্দেহ-সংশয় সৃষ্টি হবে এবং তাতে করে তারা আল্লাহ্ ও রসূলকে অস্বীকারও করে বসতে পারে।

কোন্ কোন্ পাপের জন্য সমগ্র সৃষ্টি লা'নত করে ঃ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ —আয়াতে কোরআনে-করীম লা'নত বা অভিসম্পাতকারীদের নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করেনি। তফসীর শাস্ত্রের ইমাম হযরত মুজাহিদ ও ইকরিমা (রাঃ) বলেছেন, এভাবে বিষয়টি অনির্ধারিত রাখাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু এবং প্রতিটি সৃষ্টিই তাদের উপর অভিসম্পাত করে থাকে। এমনকি জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গও তাদের প্রতি অভিসম্পাত করে। কারণ, তাদের অপকর্মের দরুন সেসব সৃষ্টিরও ক্ষতিসাধিত হয়। হযরত বারা' ইবনে আযেব (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। তাতে রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, اللّٰعِنُوْنَ —এর অর্থ হল সমগ্র পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীব।—(কুরতুবী)

কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির প্রতি লা'নত করা ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয় যতক্ষণ না তার কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণের বিষয় নিশ্চিত হওয়া যায় ঃ وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ —বাক্যাংশের দ্বারা জাস্‌সাস ও কুরতুবী প্রমুখ উদ্ভাবন করেছেন যে, যে কাফের কুফর অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে বলে নিশ্চিত নয়, তার প্রতি লা'নত করা বৈধ নয়। আর আমাদের পক্ষে যেহেতু কারও শেষ পরিণতির (মৃত্যুর) নিশ্চিত অবস্থা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কোন উপায় নেই, সেহেতু কোন কাফেরের নাম নিয়ে তার প্রতি লা'নত বা অভিসম্পাত করাও জায়েয নয়। বস্তুতঃ রসূলে করীম (সাঃ) যে সমস্ত কাফেরের নামোল্লেখ করে লা'নত করেছেন, কুফর অবস্থায় তাদের মৃত্যু সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে তিনি অবহিত হয়েছিলেন। অবশ্য সাধারণ কাফের ও জালেমদের প্রতি অনির্দিষ্টভাবে লা'নত করা জায়েয।

এতে একথাও প্রতীয়মান হয়ে যায় যে, লা'নতের ব্যাপারটি যখন এতই কঠিন ও নাযুক যে, কুফর অবস্থায় মৃত্যু সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে কোন কাফেরের প্রতিও লা'নত করা বৈধ নয়, তখন কোন মুসলমান কিংবা কোন জীব-জন্তুর উপর কেমন করে লা'নত করা যেতে পারে? পক্ষান্তরে সাধারণ মানুষ, বিশেষতঃ আমাদের নারী সম্প্রদায় একান্ত গাফলতিতে পড়ে আছে। তারা কথায় কথায় নিজেদের আপনজনদের প্রতিও অভিসম্পাত বা লা'নত বাক্য ব্যবহার করতে থাকে এবং শুধু লা'নত বাক্য ব্যবহার করেই সন্তুষ্ট হয় না; বরং তার সমার্থক যে সমস্ত শব্দ জানা থাকে সেগুলোও ব্যবহার করতে কসুর করে না। লা'নতের প্রকৃত অর্থ হল, আল্লাহ্‌র রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া। কাজেই কাউকে 'মরদুদ', 'আল্লাহ্‌র অভিশপ্ত' প্রভৃতি শব্দে গালি দেয়াও লা'নতেরই সমপর্যায়ভুক্ত।

আরবের মুশরিকরা যখন নিজেদের বিশ্বাসের পরিপন্থী আয়াত وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ শুনল, তখন বিস্মিত হয়ে বলতে লাগল, সারা বিশ্বেরই কি একজন মাত্র উপাস্য হতে পারে? যদি এ দাবী যথার্থ হয়ে থাকে, তবে তার কোন প্রমাণ উপস্থাপন করা উচিত। সুতরাং আল্লাহ্ তা'আলা তারই প্রমাণ পেশ করেছেন আলোচ্য আয়াতে।

তওহীদের মর্মার্থ ঃ وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ বিভিন্নভাবেই আল্লাহ্ তাআলার তওহীদ বা একত্ববাদ সপ্রমাণিত রয়েছে। উদাহরণতঃ তিনি একক, সমগ্র বিশ্বে না আছে তাঁর তুলনা, না আছে কোন সমকক্ষ। সুতরাং একক উপাস্য হওয়ার অধিকারও একমাত্র তাঁরই।

দ্বিতীয়তঃ উপাস্য হওয়ার অধিকারেও তিনি একক। অর্থাৎ, তাঁকে ছাড়া অন্য আর কেউই এবাদতের যোগ্য নয়।

তৃতীয়তঃ সত্তার দিক দিয়েও তিনি একক। অর্থাৎ অংশী-বিশিষ্ট নন। তিনি অংশী ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র। তাঁর বিভক্তি কিংবা ব্যবচ্ছেদ হতে পারে না।

চতুর্থতঃ তিনি তাঁর আদি ও অনন্ত সত্তার দিক দিয়েও একক। তিনি তখনও বিদ্যমান ছিলেন, যখন অন্য কোন কিছুই ছিল না এবং তখনও বিদ্যমান থাকবেন যখন কোন কিছুই থাকবে না। অতএব, তিনিই একমাত্র

সত্তা যাকে وَاحِدٌ বা 'এক' বলা যেতে পারে। وَاحِدٌ শব্দটিতে উল্লেখিত যাবতীয় দিকের একত্বই বিদ্যমান রয়েছে।— (জাস্‌সাস)

তারপর আল্লাহ্ তা'আলার প্রকৃত একত্ব সম্পর্কে বাস্তব লক্ষণ ও প্রমাণাদি উপস্থাপিত করা হয়েছে, যা জ্ঞানী-নির্জ্ঞান নির্বিশেষে যে কেউই বুঝতে পারে। আসমান ও যমীনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের চিরাচরিত বিবর্তন তাঁরই ক্ষমতার পরিপূর্ণতা ও একত্ববাদের প্রকৃত প্রমাণ।

তেমনিভাবে পানির উপর নৌকা ও জাহাজ তথা জলযানসমূহের চলাচলও একটি বিরাট প্রমাণ। পানিকে আল্লাহ্ তা'আলা এমন এক তরল পদার্থ করে সৃষ্টি করেছেন যে, একান্ত তরল ও প্রবাহমান হওয়া সত্ত্বেও তার পিঠের উপর লক্ষ লক্ষ মণ ওজনবিশিষ্ট বিশালকায় জাহাজ বিরাট ওজনের চাপ নিয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলাচল করে। তদুপরি এগুলোকে গতিশীল করে তোলার জন্য বাতাসের গতি ও নিতান্ত রহস্যপূর্ণভাবে সে গতির পরিবর্তন করতে থাকা প্রভৃতি বিষয়ও এদিকেই ইঙ্গিত করে যে, এগুলোর সৃষ্টি ও পরিচালনার পেছনে এক মহাজ্ঞানী ও মহাবিজ্ঞ সত্তা বিদ্যমান। পানীয় পদার্থগুলো তরল না হলে যেমন এ কাজটি সম্ভব হতো না, তেমনি বাতাসের মাঝে গতি সৃষ্টি না হলেও জাহাজ চলতে পারতো না; এগুলোর পক্ষে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করাও সম্ভব হতো না। এ বিষয়টিই কোরআনে-হাকীম এভাবে উল্লেখ করেছেঃ

إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَىٰ ظَهْرِهِ

অর্থাৎ, "আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে বাতাসের গতিকে স্তব্ধ করে দিতে পারেন এবং তখন এ সমস্ত জাহাজ সাগর পৃষ্ঠে ঠায় দাঁড়িয়ে যাবে।"

بِمَا يَنفَعُ النَّاسَ শব্দের দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সামুদ্রিক জাহাজের মাধ্যমে এক দেশের মালামাল অন্য দেশে আমদানী-রফতানী করার মাঝেও মানুষের এত বিপুল কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা গণনাও করা যায় না। আর এ উপকারিতার ভিত্তিতেই যুগে যুগে, দেশে দেশে নতুন নতুন বাণিজ্যপন্থা উদ্ভাবিত হয়েছে।

এমনিভাবে আকাশ থেকে এভাবে পানিকে বিন্দু বিন্দু করে বর্ষণ করা, যাতে কোনকিছুর ক্ষতিসাধিত না হয়। যদি এ পানি প্লাবনের আকারে আসত, তাহলে কোন মানুষ, জীব-জন্তু কিংবা অন্যান্য জিনিসপত্র কিছুই থাকত না। অতঃপর পানি বর্ষণের পর ভূ-পৃষ্ঠে তাকে সংরক্ষণ করা মানুষের সাধ্যায়ত্ত ব্যাপার ছিল না। যদি তাদেরকে বলা হতো, তোমাদের সবাই নিজ নিজ প্রয়োজনমত ছ'মাসের প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষণ করে রাখ, তাহলে তারা পৃথক পৃথকভাবে কি সে ব্যবস্থা করতে পারত? আর কোনক্রমে রেখে দিলেও সেগুলোকে পচন কিংবা বিনষ্ট হওয়ার হাত থেকে কেমন করে রক্ষা করত? কিন্তু আল্লাহ্ রাব্বুল-আলামীন নিজেই সে ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

فَأَسْكَنَّاهُ فِي الْأَرْضِ ۖ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِ لَقَادِرُونَ

অর্থাৎ, "আমি পানিকে ভূমিতে ধারণ করিয়েছি, যদিও বৃষ্টির পানি পড়ার পর তাকে প্রবাহিত করেই নিঃশেষ করে দেয়ার ক্ষমতা আমার ছিল।"

কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা পানিকে বিশ্ববাসী মানুষ ও জীব-জন্তুর জন্য কোথাও উন্মুক্ত খাদ-খন্দে সংরক্ষিত করেছেন, আবার কোথাও ভূমিতে বিস্তৃত বিভিন্ন স্তরের মাধ্যমে ভূমির অভ্যন্তরে সংরক্ষণ করেছেন। তারপর এমন এক ফল্গুধারা সমগ্র যমীনে বিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে মানুষ যে কোনখানে খনন করে পানি বের করে নিতে পারে। আবার এই পানিরই একটা অংশকে জমাট বাঁধা সাগর বানিয়ে তুষার আকারে পাহাড়ের চূড়ায় চাপিয়ে দিয়েছেন যা পতিত কিংবা নষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে একান্ত সংরক্ষিত; অথচ ধীরে ধীরে গলে প্রাকৃতিক ঝর্ণাধারার মাধ্যমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। সারকথা, উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলার পরিপূর্ণ ক্ষমতার কয়েকটি বিকাশস্থলের বর্ণনার মাধ্যমে তওহীদ বা একত্ববাদই প্রমাণ করা হয়েছে।

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ
اللّٰهِ ؕ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَشَدُّ حُبًّا لِّلّٰهِ ؕ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا ۙ اِذْ
يَرَوْنَ الْعَذَابَ ۙ اَنَّ الْقُوَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا ۙ وَّاَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ ﴿١٦٥﴾
اِذْ تَبَرَّاَ الَّذِيْنَ اتُّبِعُوْا مِنَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا وَرَاَوُا الْعَذَابَ وَ
تَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ ﴿١٦٦﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْا لَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً
فَنَتَبَرَّاَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوْا مِنَّا ؕ كَذٰلِكَ يُرِيْهِمُ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ
حَسَرٰتٍ عَلَيْهِمْ ؕ وَمَا هُمْ بِخٰرِجِيْنَ مِنَ النَّارِ ﴿١٦٧﴾ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا
مِمَّا فِى الْاَرْضِ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ؕ
اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ ﴿١٦٨﴾ اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ وَاَنْ
تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿١٦٩﴾ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ اتَّبِعُوْا مَآ
اَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوْا بَلْ نَتَّبِعُ مَآ اَلْفَيْنَا عَلَيْهِ اٰبَآءَنَا ؕ اَوَلَوْ كَانَ
اٰبَآؤُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ شَيْـًٔا وَّلَا يَهْتَدُوْنَ ﴿١٧٠﴾ وَمَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا
كَمَثَلِ الَّذِىْ يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ اِلَّا دُعَآءً وَّنِدَآءً ؕ صُمٌّۢ بُكْمٌ
عُمْىٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿١٧١﴾ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ
مَا رَزَقْنٰكُمْ وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ﴿١٧٢﴾

(১৬৫) আর কোন লোক এমনও রয়েছে যারা অন্যান্যকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে এবং তাদের প্রতি তেমনি ভালবাসা পোষণ করে, যেমন আল্লাহ্‌র প্রতি ভালবাসা হয়ে থাকে। কিন্তু যারা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমানদার তাদের ভালবাসা ওদের তুলনায় বহুগুণ বেশী। আর কতইনা উত্তম হ'ত যদি এ জালেমরা পার্থিব কোন কোন আযাব প্রত্যক্ষ করেই উপলব্ধি করে নিত যে, যাবতীয় ক্ষমতা শুধুমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য এবং আল্লাহ্‌র আযাবই সবচেয়ে কঠিনতর। (১৬৬) অনুসৃতরা যখন অনুসরণকারীদের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যাবে এবং যখন আযাব প্রত্যক্ষ করবে আর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে তাদের পারস্পরিক সমস্ত সম্পর্ক (১৬৭) এবং অনুসারীরা বলবে, কতইনা ভাল হত, যদি আমাদিগকে পৃথিবীতে ফিরে যাবার সুযোগ দেয়া হত! তাহলে আমরাও তাদের প্রতি তেমনি অসন্তুষ্ট হয়ে যেতাম, যেমন তারা অসন্তুষ্ট হয়েছে আমাদের প্রতি। এভাবেই আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে দেখাবেন তাদের কৃতকর্ম তাদেরকে অনুতপ্ত করার জন্যে। অথচ, তারা কস্মিনকালেও আগুন থেকে বের হতে পারবে না। (১৬৮) হে মানবমণ্ডলী, পৃথিবীর হালাল ও পবিত্র বস্তু-সামগ্রী ভক্ষণ কর। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না; সে নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১৬৯) সে তো এ নির্দেশই তোমাদিগকে দেবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্‌র প্রতি এমনসব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর যা তোমরা জান না। (১৭০) আর যখন তাদেরকে কেউ বলে যে, সে হুকুমেরই আনুগত্য কর যা আল্লাহ্ তা'আলা নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে কখনো না, আমরা তো সে বিষয়েরই অনুসরণ করব, যাতে আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে দেখেছি। যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই জানতো না, জানতো না সরল পথও। (১৭১) বস্তুতঃ এহেন কাফেরদের উদাহরণ এমন, যেন কেউ এমন কোন জীবকে আহ্বান করছে যা কোন কিছুই শোনে না, হাঁক-ডাক আর চিৎকার ছাড়া—বধির মূক, এবং অন্ধ। সুতরাং তারা কিছুই বোঝে না। (১৭২) হে ঈমানদারগণ, তোমরা পবিত্র বস্তু-সামগ্রী আহার কর, যেগুলো আমি তোমাদেরকে রুযী হিসাবে দান করেছি এবং শুকরিয়া আদায় কর আল্লাহ্‌র, যদি তোমরা তাঁরই বন্দেগী কর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

শব্দ বিশ্লেষণ ঃ حَلٰلًا طَيِّبًا حل- শব্দের প্রকৃত অর্থ হল গিঠ খোলা। যেসব বস্তু-সামগ্রীকে মানুষের জন্য হালাল বা বৈধ করে দেয়া হয়েছে, তাতে যেন একটা গিঁঠই খুলে দেয়া হয়েছে এবং সেগুলোর উপর থেকে বাধ্যবাধকতা সরিয়ে নেয়া হয়েছে। হযরত সাহ্‌ল ইবনে আবদুল্লাহ্ (রাঃ) বলেন, মুক্তি বা পরিত্রাণ লাভ তিনটি বিষয়ের উপর নির্ভরশীল- (১) হালাল খাওয়া, (২) ফরয আদায় করা এবং (৩) রসূলে করীম (সাঃ)-এর সুন্নতসমূহের আনুগত্য ও অনুসরণ করা। طيب শব্দের অর্থ পবিত্র। শরীয়তের দৃষ্টিতে হালাল এবং মানসিক দিক দিয়ে আকর্ষণীয় সমস্ত বস্তু-সামগ্রীও এরই অন্তর্ভুক্ত।

خطوات (খুতুওয়াত) خطوة (খুতওয়াতুন) -এর বহুবচন। خطوة বলা হয় পায়ের দুই ধাপের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে। সুতরাং خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ -এর অর্থ হচ্ছে শয়তানী কাজকর্ম।

بِالسُّوْٓءِ وَالْفَحْشَآءِ سوء- বলা হয় এমন বস্তু বা বিষয়কে যা দেখে রুচিজ্ঞানসম্পন্ন যে কোন বুদ্ধিমান লোক দুঃখবোধ করে। فحشاء অর্থ অশ্লীল ও নির্লজ্জ কাজ। আবার অনেকে বলেন যে, এ ক্ষেত্রে سوء এবং فحشاء —এর মর্ম যথাক্রমে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পাপ। অর্থাৎ, সাধারণ গোনাহ এবং কবীরা গোনাহ। اِنَّمَا يَاْمُرُكُمْ - এখানে শয়তানের নির্দেশদান অর্থ হচ্ছে মনের মাঝে ওস্‌ওয়াসা বা সন্দেহের উদ্ভব করা। যেমন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাস্‌উদ (রাঃ) বর্ণিত এক হাদীসে রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন— আদম-সন্তানদের অন্তরে একাধারে শয়তানী প্রভাব এবং ফেরেশতার প্রভাব বিদ্যমান থাকে। শয়তানী ওসওয়াসার প্রভাবে অসৎ কাজের কল্যাণ এবং উপকারিতাগুলো সামনে এসে উপস্থিত হয় এবং তাতে সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার পথগুলো উন্মুক্ত হয়। পক্ষান্তরে ফেরেশতাদের এলহামের প্রভাবে সৎ ও নেক কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'আলা যে কল্যাণ ও পুরস্কার দানের ওয়াদা করেছেন, সেগুলোর প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয় এবং সত্য ও সঠিক পথে চলতে গিয়ে অন্তরে শান্তি লাভ হয়।

এ আয়াতের দ্বারা বাপ-দাদা, পূর্বপুরুষের অন্ধ অনুকরণ-অনুসরণের যেমন নিন্দা প্রমাণিত হয়েছে, তেমনি বৈধ অনুসরণের জন্যে কতিপয় শর্ত এবং একটা নীতিও জানা যাচ্ছে। যেমন, দু'টি শব্দে বলা হয়েছে لَا يَعْقِلُوْنَ এবং لَا يَهْتَدُوْنَ এতে প্রতীয়মান হয় যে, বাপ-দাদা পূর্ব-পুরুষদের আনুগত্য ও অনুসরণ এ জন্য নিষিদ্ধ যে, তাদের মধ্যে না ছিল জ্ঞান-বুদ্ধি, না ছিল কোন খোদায়ী হেদায়েত। হেদায়েত বলতে সে সমস্ত বিধি-বিধানকে বোঝায়, যা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিল করা হয়েছে। আর জ্ঞান-বুদ্ধি বলতে সে সমস্ত বিষয়কে বোঝানো হয়েছে, যা শরীয়তের প্রকৃষ্ট 'নছ' বা নির্দেশ থেকে গবেষণা করে বের করা হয়।

অতএব, তাদের আনুগত্য ও অনুসরণ নিষিদ্ধ হওয়ার কারণটি সাব্যস্ত হল এই যে, তাদের কাছে না আছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কোন বিধি বিধান, না আছে তাদের মধ্যে আল্লাহ্ তা'আলার বাণীর পর্যালোচনা-গবেষণা করে তা থেকে বিধি-বিধান বের করে নেয়ার মত কোন যোগ্যতা। এতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন আলেমের

ব্যাপারে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস হলে যে, কোরআন ও সুন্নাহর জ্ঞানের সাথে সাথে তাঁর মধ্যে এজতেহাদ (উদ্ভাবন)–এর যোগ্যতাও রয়েছে, তবে এমন মুজতাহেদ আলেমের আনুগত্য–অনুসরণ করা জায়েয। অবশ্য এ আনুগত্য তাঁর ব্যক্তিগত হুকুম মানার জন্যে নয়, বরং আল্লাহ্র এবং তাঁর হুকুম–আহকাম মানার জন্যেই হতে হবে। যেহেতু আমরা সরাসরি আল্লাহ্র সম্পর্কে ওয়াকেফহাল হতে পারি না, সেহেতু কোন মুজতাহেদ আলেমের অনুসরণ করি, যাতেকরে আল্লাহ্র বিধি–বিধান অনুযায়ী আমল করা যায়।

অন্ধ অনুসরণ এবং মুজতাহেদ ইমামগণের অনুসরণের মধ্যে পার্থক্য ঃ উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বুঝা যায় যে, যারা সাধারণভাবে মুজতাহেদ ইমামদের অনুসরণের বিরুদ্ধে এ আয়াতটি উদ্ধৃত করেন, তারা নিজেরাই এ আয়াতের আসল প্রতিপাদ্য সম্পর্কে ওয়াকেফহাল নন।

এ আয়াতের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী লিখেছেন, এ আয়াতে যে পূর্ব–পুরুষের আনুগত্য ও অনুসরণের কথা নিষেধ করা হয়েছে, তার প্রকৃত মর্ম হল ভ্রান্ত এবং মিথ্যা বিশ্বাস ও কার্যকলাপের ক্ষেত্রে বাপ–দাদা ও পূর্ব–পুরুষের অনুসরণ। যথার্থ ও সঠিক বিশ্বাস এবং সৎকর্মে তাদের অনুসরণ করা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন, সূরা ইউসুফে হযরত ইউনুস (আঃ)–এর সংলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে এ দু'টি বিষয়ের বিশ্লেষণ করা হয়েছে ঃ

—'আমি সে জাতির ধর্মবিশ্বাসকে পরিহার করেছি, যারা আল্লাহ্র প্রতি বিশ্বাস করে না এবং যারা আখেরাতকে অস্বীকার করে। পক্ষান্তরে আমি অনুসরণ করেছি আমাদের পিতা ইবরাহীম, ইসহাক ও ইয়াকুব (আঃ)–এর ধর্মবিশ্বাসের।'

এ আয়াতের দ্বারা প্রকৃষ্টভাবে প্রমাণিত হয়ে যায় যে, মিথ্যা ও ভ্রান্ত বিষয়ে বাপ–দাদাদের অনুসরণ করা হারাম, কিন্তু বৈধ ও সৎকর্মের বেলায় তা জায়েয ; বরং প্রশংসনীয়।

ইমাম কুরতুবী এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মুজতাহেদ ইমামগণের আনুগত্য ও অনুসরণ সম্পর্কিত মাসআলা–মাসায়েল এবং অন্যান্য বিধি–বিধানেরও উল্লেখ করেছেন।

হালাল খাওয়ার বরকত ও হারাম খাদ্যের অকল্যাণ ঃ আলোচ্য আয়াতে যেমন হারাম খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে, তেমনিভাবে হালাল ও পবিত্র বস্তু খেতে এবং তা খেয়ে শুকরিয়া আদায় করতে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। কারণ, হারাম খেলে যেমন মন্দ অভ্যাস ও অসচ্চরিত্রতা সৃষ্টি হয়, এবাদতের আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে এবং দোয়া কবুল হয় না, তেমনিভাবে হালাল খানায় অন্তরে এক প্রকার নূর সৃষ্টি হয়। তদ্দ্বারা অন্যায়–অসচ্চরিত্রতার প্রতি ঘৃণাবোধ এবং সততা ও সচ্চরিত্রতার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়; এবাদত–বন্দেগীর প্রতি অধিকতর মনোযোগ আসে, পাপের কাজে মনে ভয় আসে এবং দোয়া কবুল হয়। এ কারণেই আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সমস্ত নবী–রসূলগণের প্রতি হেদায়েত করেছেন যে –

يَٰٓأَيُّهَا ٱلرُّسُلُ كُلُوا۟ مِنَ ٱلطَّيِّبَٰتِ وَٱعْمَلُوا۟ صَٰلِحًا

'হে আমার রসূলগণ ! তোমরা পবিত্র খাদ্য গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর।'

এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নেক আমলের ব্যাপারে হালাল খাদ্যের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অনুরূপ হালাল খাদ্য গ্রহণে দোয়া কবুল হওয়ার আশা এবং হারাম খাদ্যের প্রতিক্রিয়ায় তা কবুল না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে বেশী। রসূল (সাঃ)–এরশাদ করেছেন,— বহু লোক দীর্ঘ সফর করে আসে এবং অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে দু'হাত তুলে আল্লাহ্র দরবারে বলতে থাকে, ইয়া পরওয়ারদেগার ! ইয়া রব !' কিন্তু যেহেতু সে ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পরিধেয় পোশাক–পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় তার দোয়া কি করে কবুল হতে পারে? – (মুসলিম, তিরমিযী, – ইবনে–কাসীর–এর বরাতে)

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ
لِغَيْرِ اللَّهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٧٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ
يَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۙ أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا
النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ ﴿١٧٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ
بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿١٧٥﴾ ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ
بَعِيدٍ ﴿١٧٦﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ
الْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۙ وَالسَّائِلِينَ وَفِي
الرِّقَابِ ۚ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ ۚ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ
إِذَا عَاهَدُوا ۖ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

(১৭৩) তিনি তোমাদের উপর হারাম করেছেন, মৃত জীব, রক্ত, শূকর মাংস এবং সেসব জীব-জন্তু যা আল্লাহ্ ব্যতীত অপর কারো নামে উৎসর্গ করা হয়। অবশ্য যে লোক অনন্যোপায় হয়ে পড়ে এবং না-ফরমানী ও সীমালঙ্ঘনকারী না হয়, তার জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহান ক্ষমাশীল ,অত্যন্ত দয়ালু। (১৭৪) নিশ্চয় যারা সেসব বিষয় গোপন করে, যা আল্লাহ্ কিতাবে নাযিল করেছেন এবং সেজন্য অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা আগুন ছাড়া নিজের পেটে আর কিছুই ঢুকায় না। আর আল্লাহ কেয়ামতের দিন তাদের সাথে না কথা বলবেন, না তাদের পবিত্র করা হবে। বস্তুতঃ তাদের জন্যে রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৫) এরাই হল সে সমস্ত লোক, যারা হেদায়েতের বিনিময়ে গোমরাহী খরিদ করেছে এবং (খরিদ করেছে) ক্ষমা ও অনুগ্রহের বিনিময়ে আযাব। অতএব, তারা দোযখের উপর কেমন ধৈর্যধারণকারী। (১৭৬) আর এটা এজন্যে যে, আল্লাহ্ নাযিল করেছেন সত্যপূর্ণ কিতাব। আর যারা কেতাবের মাঝে মতবিরোধ সৃষ্টি করেছে নিশ্চয়ই তারা জেদের বশবর্তী হয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। (১৭৭) সৎকর্ম শুধু এই নয় যে, পূর্ব কিংবা পশ্চিমদিকে মুখ করবে, বরং বড় সৎকাজ হল এই যে, ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, কিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাদের উপর এবং সমস্ত নবী-রসূলগণের উপর, আর সম্পদ ব্যয় করবে তাঁরই মহব্বতে আত্মীয়-স্বজন, এতীম-মিসকীন, মুসাফির-ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্যে। আর যারা নামায প্রতিষ্ঠা করে, যাকাত দান করে এবং যারা কৃত প্রতিজ্ঞা সম্পাদনকারী এবং অভাবে, রোগে-শোকে ও যুদ্ধের সময় ধৈর্য্যধারণকারী, তারাই হল সত্যাশ্রয়ী, আর তারাই পরহেযগার।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

আলোচ্য আয়াতে যে বস্তু-সামগ্রীকে হারাম হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলোর সংখ্যা চার। যেমন, মৃত পশু, রক্ত, শূকর মাংস এবং যেসব জানোয়ার আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। উপরোক্ত চিহ্নিত চারটি বস্তুর সাথে স্বয়ং কোরআনেরই অন্য আয়াতে এবং হাদীস শরীফে আরো কতিপয় বস্তুর উল্লেখ এসেছে। সুতরাং সেসব নির্দেশ একত্রিত করে চিহ্নিত হারাম বস্তুগুলো সম্পর্কে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা যেতে পারে।

মৃত ঃ এর অর্থ যেসব প্রাণী হালাল করার জন্য শরীয়তের বিধান অনুযায়ী যবেহ্ করা জরুরী, সেসব প্রাণী যদি যবেহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে যেমন, আঘাত প্রাপ্ত হয়ে, অসুস্থ হয়ে, কিংবা দম বন্ধ হয়ে মারা যায়, তবে সেগুলোকে মৃত বলে গণ্য করা হবে এবং সেগুলোর গোশত খাওয়া হারাম হবে।

তবে কোরআন শরীফের অন্য এক আয়াতে বলা হয়েছে ঃ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ 'তোমাদের জন্য সামুদ্রিক শিকার হালাল করা হলো।'

এ আয়াতের মর্মানুযায়ী সামুদ্রিক জীব-জন্তুর বেলায় যবেহ্ করার শর্ত আরোপিত হয়নি। ফলে এগুলো যবেহ্ ছাড়াই খাওয়া হালাল। অনুরূপ এক হাদীসে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গকে মৃত প্রাণীর তালিকা থেকে বাদ দিয়ে এ দু'টির মৃতকেও হালাল করা হয়েছে। রসূল (সাঃ) এরশাদ করেছেন— আমাদের জন্য দু'টি মৃত হালাল— মাছ এবং টিড্ডি। সুতরাং বোঝা গেল যে, জীব-জন্তুর মধ্যে মাছ এবং টিড্ডি নামক পতঙ্গ মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে না, এ দু'টি যবেহ্ না করেও খাওয়া যাবে। তবে মাছ পানিতে মরে যদি পচে যায় এবং পানির উপরে ভেসে উঠে, তবে তা খাওয়া যাবে না।- (জাস্সাস)। অনুরূপ যেসব বন্য জীব-জন্তু ধরে যবেহ্ করা সম্ভব নয়, সেগুলোকে বিসমিল্লাহ্ বলে তীর কিংবা অন্য কোন ধারালো অস্ত্র দ্বারা আঘাত করে যদি মারা হয়, তবে সেগুলোও হালাল হবে, এমতাবস্থায়ও শুধু আঘাত দিয়ে মারলে চলবে না, কোন ধারালো অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত করা শর্ত।

মাসআলা ঃ ইদানীং এক রকম চোখা গুলী ব্যবহৃত হয়, এ ধরনের গুলী সম্পর্কে কোন কোন আলেম মনে করেন যে, এসব ধারালো গুলীর আঘাতে মৃত জন্তুর হুকুম তীরের আঘাতে মৃতের পর্যায়ভুক্ত হবে। কিন্তু আলেমগণের সম্মিলিত অভিমত অনুযায়ী বন্দুকের গুলী চোখা এবং ধারালো হলেও তা তীরের পর্যায়ভুক্ত হয় না। কেননা, তীরের আঘাত ছুরির আঘাতের ন্যায়, অপরপক্ষে বন্দুকের গুলী চোখা হলেও গায়ে বিদ্ধ হয়ে বারুদের বিস্ফোরণ ও দাহিকা শক্তির প্রভাবে জন্তুর মৃত্যু ঘটায়। সুতরাং এরূপ গুলীর দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত জানোয়ারও যবেহ্ করার আগে মারা গেলে তা খাওয়া হালাল হবে না।

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াতে 'তোমাদের জন্য মৃত হারাম' বলাতে মৃত জানোয়ারের গোশ্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি এগুলোর ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে। যাবতীয় অপবিত্র বস্তু সম্পর্কে সে একই বিধান প্রয়োজ্য।

অর্থাৎ, এগুলোর ব্যবহার যেমন হারাম, তেমনি এগুলো ক্রয়-বিক্রয় কিংবা অন্য কোন উপায়ে এগুলো থেকে যে কোনভাবে লাভবান হওয়াও হারাম। এমনকি মৃত জীব-জন্তুর গোশ্ত নিজ হাতে কোন গৃহপালিত

জন্তুকে খাওয়ানোও জায়েয নয়। বরং সেগুলো এমন কোন স্থানে ফেলে দিতে হবে, যেন কুকুর-বিড়ালে খেয়ে ফেলে। নিজ হাতে উঠিয়ে কুকুর-বিড়ালকে খাওয়ানোও জায়েয হবে না।— (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

মাসআলাঃ 'মৃত' শব্দটির অন্য কোন বিশেষণ ছাড়া সাধারণভাবে ব্যবহার করাতে প্রতীয়মান হয় যে, হারামের হুকুমও ব্যাপক এবং তন্মধ্যে মৃত জন্তুর সমুদয় অংশই শামিল। কিন্তু অন্য এক আয়াতে عَلٰى طَاعِمٍ يَّطْعَمُهٗ শব্দ দ্বারা এ বিষয়টিও ব্যাখ্যা করে দেয়া হয়েছে। তাতে বুঝা যায় যে, মৃত জন্তুর শুধু সে অংশই হারাম যেটুকু খাওয়ার যোগ্য। সুতরাং মৃত জন্তুর হাড়, পশম প্রভৃতি যেসব অংশ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয় না, সেগুলো ব্যবহার করা হারাম নয়; সম্পূর্ণ জায়েয। কেননা, কোরআনের অন্য এক আয়াতে আছেঃ

وَمِنْ اَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِهَا وَاَشْعَارِهَآ اَثَاثًا وَّمَتَاعًا اِلٰى حِيْنٍ

এতে হালাল জানোয়ারসমূহের পশম প্রভৃতির দ্বারা ফায়দা গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু এখানে যবেহ করার শর্ত আরোপ করা হয়নি।— (জাস্‌সাস)

চামড়ার মধ্যে যেহেতু রক্ত প্রভৃতি নাপাকীর সংমিশ্রণ থাকে, সেজন্য মৃত জানোয়ারের চামড়া শুকিয়ে পাকা না করা পর্যন্ত নাপাক এবং ব্যবহার হারাম। কিন্তু পাকা করে নেয়ার পর ব্যবহার করা সম্পূর্ণ জায়েয। সহীহ হাদীসে এ সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা রয়েছে।— (জাস্‌সাস)

মাসআলাঃ মৃত জানোয়ারের চর্বি এবং তদ্দ্বারা তৈরী যাবতীয় বস্তুই হারাম। এসবের ব্যবহার কোন অবস্থাতেই জায়েয নয়। এমনকি এসবের ক্রয়-বিক্রয়ও হারাম।

রক্ত ঃ আলোচ্য আয়াতে যেসব বস্তু-সামগ্রীকে হারাম করা হয়েছে, তার দ্বিতীয়টি হচ্ছে রক্ত। এ আয়াতে শুধু রক্ত উল্লেখিত হলেও সূরা আন'আমের এক আয়াতে اَوْ دَمًا مَّسْفُوْحًا অর্থাৎ 'প্রবাহমান রক্ত' উল্লেখিত রয়েছে। রক্তের সাথে 'প্রবাহমান' শব্দ সংযুক্ত করার ফলে শুধু প্রবাহিত রক্তকেই হারাম করা হয়েছে, যা যবেহ করলে বা কেটে গেলে প্রবাহিত হয়। এ কারণেই কলিজা-যকৃৎ প্রভৃতি জমাট বাঁধা রক্তে গঠিত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী পাক ও হালাল।

মাসআলা ঃ যেহেতু শুধুমাত্র প্রবাহমান রক্তই হারাম ও নাপাক, সেজন্যই যবেহ করা জন্তুর গোশতের সাথে রক্তের যে অংশ জমাট বেঁধে রয়ে যায়, সেটুকু হালাল ও পাক। ফেকাহ্‌বিদ সাহাবী ও তাবেয়ীসহ সমস্ত আলেম সমাজ এ ব্যাপারে একমত। একই কারণে মশা-মাছি ও কাপড়ে লাগা রক্ত নাপাক নয়। তবে যদি রক্ত বেশী হয় এবং ছড়িয়ে যায়, তবে তা ধুয়ে ফেলা উচিত।— (জাস্‌সাস)

মাসআলা ঃ রক্ত খাওয়া যেমন হারাম, তেমনি অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবহার করাও হারাম। অন্যান্য নাপাক রক্তের ন্যায় রক্তের ক্রয়-বিক্রয় এবং তদ্দ্বারা অর্জিত লাভালাভ ও হারাম। কেননা, কোরআনের আয়াতে 'রক্ত' শব্দটি অন্য কোন বিশেষণ ব্যতীতই ব্যবহৃত হওয়ার কারণে রক্ত বলতে যা বুঝায়, তার সম্পূর্ণটাই হারাম প্রতিপন্ন হয়ে গেছে।

মানুষের গায়ে অন্যের রক্ত দেয়ার মাসআলা ঃ এই মাসআলার বিষয় নিম্নরূপ ঃ রক্ত মানুষের শরীরের অংশ। শরীর থেকে বের করে নেওয়ার পর তা নাপাক। তদনুসারে প্রকৃত প্রস্তাবে একজনের রক্ত অন্যজনের শরীরে প্রবেশ করানো দু'কারণে হারাম হওয়া উচিত, প্রথমতঃ মানুষের যেকোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সম্মানিত এবং আল্লাহ্ কর্তৃক সংরক্ষিত। শরীর থেকে পৃথক করে নিয়ে তা অন্যত্র সংযোজন করা সে সম্মান ও সংরক্ষণ বিধানের পরিপন্থী। দ্বিতীয়তঃ এ কারণে যে, রক্ত 'নাজাসাতে-গলীযা' বা জঘন্য ধরনের নাপাকী। আর নাপাক বস্তুর ব্যবহার জায়েয নয়।

তবে নিরুপায় অবস্থায় এবং চিকিৎসাক্ষেত্রে ইসলামী শরীয়ত যেসব সুযোগ-সুবিধা দিয়েছে, সেগুলোর ভিত্তিতে চিন্তা-ভাবনা করলে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

প্রথমতঃ রক্ত যদিও মানুষের শরীরেরই অংশ, তথাপি এটা অন্য মানুষের শরীরে স্থানান্তরিত করার জন্য যার রক্ত, তার শরীরে কোন প্রকার কাটা-ছেঁড়ার প্রয়োজন হয় না,— কোন অঙ্গ কেটে পৃথক করতে হয় না। সুঁই-এর মাধ্যমে একজনের শরীর থেকে রক্ত বের করে অন্যের শরীরে প্রবেশ করিয়ে দেয়া হয়। তদনুসারে রক্তকে দুধের সাথে তুলনা করা যেতে পারে, যা অঙ্গ কর্তন ব্যতিরেকেই একজনের শরীর থেকে বের হয়ে অন্যের শরীরের অংশে পরিণত হতে থাকে। শিশুর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য করেই ইসলামী শরীয়ত মানুষের দুধকে শিশু খাদ্য হিসাবে নির্ধারিত করেছে এবং স্বীয় সন্তানকে দুধ-পান করানো মায়ের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করে দিয়েছে।

"অষুধ হিসাবে স্ত্রীলোকের দুধ পুরুষের পক্ষে নাকে প্রবেশ করানো কিংবা পান করায় দোষ নেই।" —আলমগীরি

ইবনে কুদামাহ্ রচিত 'মুগনী' গ্রন্থে এ মাসআলা সম্পর্কিত আরো বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।— (মুগনী, - কিতাবুস সাইদ, ৮ম খঃ, ২০৬ পৃষ্ঠা)

রক্তকে যদি দুধের সাথে তুলনা করা হয়, তবে তা সামঞ্জস্যহীন হবে না। কেননা, দুধ রক্তেরই পরিবর্তিত রূপ এবং মানব-দেহের অংশ হওয়ার ব্যাপারেও একই পর্যায়ভুক্ত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, দুধ পাক এবং রক্ত নাপাক। সুতরাং হারাম হওয়ার প্রথম কারণ অর্থাৎ, মানবদেহের অংশ হওয়ার ক্ষেত্রে তো নিষিদ্ধ হওয়ার ধারণা যুক্তিতে টেকে না। অবশিষ্ট থাকে দ্বিতীয় কারণ অর্থাৎ, নাপাক হওয়া। এক্ষেত্রেও চিকিৎসার বেলায় অনেক ফেকাহবিদ রক্ত ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছেন।

এমতাবস্থায় মানুষের রক্ত অন্যের দেহে স্থানান্তর করার প্রশ্নে শরীয়তের নির্দেশ দাঁড়ায় এই যে, সাধারণ অবস্থায় এটা জায়েয নয়। তবে চিকিৎসার্থ, নিরুপায় অবস্থায় অষুধ হিসাবে ব্যবহার করা নিঃসন্দেহে জায়েয। 'নিরুপায় অবস্থায়' অর্থ হচ্ছে রোগীর যদি জীবন-সংশয় দেখা দেয় এবং অন্য কোন অষুধ যদি তার জীবন রক্ষার জন্য কার্যকর বলে বিবেচিত না হয়, আর রক্ত দেয়ার ফলে তার জীবন-রক্ষার সম্ভাবনা যদি প্রবল থাকে, তবে সে অবস্থায় তার দেহে অন্যের রক্ত দেয়া কোরআন শরীফের সে আয়াতের মর্মানুযায়ীও জায়েয হবে, যে আয়াতে অনন্যোপায় অবস্থায় মৃত জন্তুর গোশত খেয়ে জীবন বাঁচানোর সরাসরি অনুমতি দেয়া হয়েছে।

আর যদি অনন্যোপায় না হয় এবং অন্য অষুধ ব্যবহারে চিকিৎসা করা সম্ভব হয়, তবে সে অবস্থায় রক্ত ব্যবহারের প্রশ্নে মতভেদ রয়েছে। কোন কোন ফেকাহবিদ একে জায়েয বলেছেন এবং কেউ কেউ না-জায়েয বলেছেন। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ ফেকাহর কিতাবসমূহে 'হারাম

বস্তুর দ্বারা চিকিৎসা' শীর্ষক আলোচনায় উল্লেখিত হয়েছে।

শূকর হারাম হওয়ার বিবরণ ঃ আলোচ্য আয়াতে তৃতীয় যে বস্তুটি হারাম করা হয়েছে, সেটি হল শূকরের গোশত। এখানে শূকরের সাথে 'লাহ্‌ম' বা গোশত শব্দ সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ইমাম কুরতুবী বলেন, এর দ্বারা শুধু গোশত হারাম একথা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। বরং শূকরের সমগ্র অংশ অর্থাৎ, হাড়, গোশত, চামড়া, চর্বি, রগ, পশম প্রভৃতি সবকিছুই সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। তবে 'লাহ্‌ম' তথা গোশত যোগ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শূকর অন্যান্য হারাম জন্তুর ন্যায় নয়, তাই এটি যবেহ করলেও পাক হয় না। কেননা, গোশত খাওয়া হারাম এমন অনেক জন্তু রয়েছে যাদের যবেহ করার পর সেগুলোর হাড়, চামড়া প্রভৃতি পাক হতে পারে। কিন্তু যবেহ করার পরও শূকরের গোশত হারাম তো বটেই, নাপাকও থেকে যায়। কেননা, এটি একাধারে যেমনি হারাম তেমনি 'নাজাসে-আইন' বা সম্পূর্ণ নাপাক। শুধুমাত্র চামড়া সেলাই করার কাজে শূকরের পশম দ্বারা তৈরী সূতা ব্যবহার করা জায়েয বলে হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে।— (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয় ঃ আয়াতে উল্লেখিত চতুর্থ হারাম বস্তু হচ্ছে সেসব জীব-জন্তু, যা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো নামে যবেহ অথবা উৎসর্গ করা হয়। সাধারণতঃ এর তিনটি উপায় প্রচলিত রয়েছে।

প্রথমতঃ আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয় এবং যবেহ করার সময়ও সে নাম নিয়েই যবেহ করা হয়, যে নামে তা উৎসর্গিত। এমতাবস্থায় যবেহকৃত জন্তু সমস্ত মত-পথের আলেম ও ফেকাহবিদগণের দৃষ্টিতেই হারাম ও নাপাক। এর কোন অংশের দ্বারাই ফায়দা গ্রহণ জায়েয হবে না। কেননা, وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতে যে অবস্থার কথা বুঝানো হয়েছে এ অবস্থা এর সরাসরি নমুনা, যে ব্যাপারে কারো কোন মতভেদ নেই।

দ্বিতীয় অবস্থা হচ্ছে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য লাভের উদ্দেশে যা যবেহ করা হয়, তবে যবেহ করার সময় তা আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই যবেহ করা হয়। যেমন, অনেক অজ্ঞ মুসলমান পীর-বুযুর্গগণের সন্তুষ্টি অর্জনের মানসে গরু, ছাগল, মুরগী ইত্যাদি মান্নত করে তা যবেহ করে থাকে। কিন্তু যবেহ করার সময় আল্লাহ্‌র নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। এ সুরতটিও ফকীহ্‌গণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী হারাম এবং যবেহকৃত জন্তু মৃতের শামিল।

তবে দলীল গ্রহণের ক্ষেত্রে এ সুরতটি সম্পর্কে কিছুটা মত-পার্থক্য রয়েছে। কোন কোন মুফাস্‌সের এবং ফেকাহ্‌বিদ এ সুরতটিকেও আয়াতে উল্লেখিত আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে যবেহকৃত জীবের বিধানের অনুরূপ বিবেচনা করেছেন। যেমন, তফসীরে বায়যাবীর টীকায় বলা হয়েছে ঃ

'সে সমস্ত জন্তুই হারাম, যা আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে উৎসর্গ করা হয়। যবেহ করার সময় তা'আল্লাহ্‌র নামেই যবেহ করা হোক না কেন। কেননা, আলেম ও ফকীহগণ এ ব্যাপারে একমত যে, যদি কোন জন্তুকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য হাসিল করার উদ্দেশে কোন মুসলমানও যবেহ করে, তবে সে ব্যক্তি 'মুরতাদ' বা ধর্মত্যাগী হয়ে যাবে এবং তার যবেহকৃত পশুটি মুরতাদের যবেহকৃত পশু বলে বিবেচিত হবে।'

দুররে মুখতার কিতাবুয-যাবায়েহ অধ্যায়ে বলা হয়েছে ঃ

"— যদি কোন আমীরের আগমন উপলক্ষে তাঁরই সম্মানার্থ কোন পশু যবেহ করা হয়, তবে যবেহকৃত সে পশুটি হারাম হয়ে যাবে। কেননা, এটাও তেমনি, আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নামে যা যবেহ করা হয়"— এ আয়াতের নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত ; যদিও যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম নিয়েই তা যবেহ করা হয়। শামীও এ অভিমত সমর্থন করেছেন।— (দুররে-মুখতার, ৫ম খঃ, ২১৪ পৃঃ)

কেউ কেউ অবশ্য উপরোক্ত সুরতটিকে وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের সাথে সরাসরি সামঞ্জস্যপূর্ণ মনে করেন না। কেননা, আয়াতের বর্ণনাভঙ্গি অনুসারে একেবারে সরাসরি তা বুঝায় না। তবে আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর নৈকট্য বা সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত দ্বারা 'আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন কিছুর উদ্দেশে যা উৎসর্গ করা হয়' সে আয়াতের প্রতি যথেষ্ট সামঞ্জস্যপূর্ণ বিধায় এ সুরতটিকেও হারাম করা হয়েছে। আমাদের বিবেচনায় এ যুক্তিই সর্বাপেক্ষা শুদ্ধ ও সাবধানতাপ্রসূত।

উপরোক্ত সুরতটি হারাম হওয়ার সমর্থনে কোরআনের অন্য আর একটি আয়াতও দলীল হিসেবে পেশ করা যায়। সে আয়াতটি হচ্ছে وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ বাতেলপন্থীরা যেসব বস্তুর পূজা করে থাকে, সেই সবকিছুকে نصب বলা হয়। সেমতে আয়াতের অর্থ হয় ঃ সে সমস্ত পশু, যেগুলোকে বাতেল উপাস্যের উদ্দেশে যবেহ করা হয়েছে।

'আরবদের স্বভাব ছিল যে, যার উদ্দেশ্যে যবেহ করা হতো, যবেহ করার সময় তারস্বরে সে নামই উচ্চারণ করতে থাকতো। ব্যাপকভাবে তাদের মধ্যে এ রেওয়াজ প্রচলিত ছিল। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য প্রত্যাশা— যা সংশ্লিষ্ট পশু হারাম হওয়ার মূল কারণ, সেটাকে 'এহ্‌লাল' অর্থাৎ, 'তারস্বরে নামোচ্চারণ' শব্দ দ্বারা বোঝানো হয়েছে।

ইমাম মুসলিম তাঁর ওস্তাদ ইয়াহ্‌ইয়া ইবনে ইয়াহ্‌ইয়ার সনদে হযরত আয়েশা সিদ্দীকার একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করেছেন। সে হাদীসের শেষভাগে রয়েছে যে, একজন স্ত্রীলোক হযরত আয়েশা (রাঃ)-কে প্রশ্ন করেছিলেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আজমী লোকদের মধ্যে আমাদের কিছুসংখ্যক দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজন রয়েছে। তাদের মধ্যে সব সময় কোন না কোন উৎসব লেগেই থাকে। উৎসবের দিনে কিছু হাদিয়া-তোহফা তারা আমাদের কাছেও পাঠিয়ে থাকে। আমরা তাদের পাঠানো সেসব সামগ্রী খাবো কিনা? জবাবে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছিলেন—

'সে উৎসব দিবসের জন্যেই যেসব পশু যবেহ করা হয়, সেগুলো খেয়ো না, তবে তাদের ফলমূল খেতে পার।'— (তফসীরে-কুরতুবী, ২য় খঃ, ২০৭ পৃঃ)।

মোটকথা, দ্বিতীয় সুরতটি, যাতে নিয়ত থাকে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর নৈকট্য লাভ, কিন্তু যবেহ করা হয় আল্লাহ্‌র নামেই, সেটিও হারাম হওয়ার মূল কারণ হচ্ছে আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন কিছুর সন্তুষ্টি বা নৈকট্য অর্জন, এর মধ্যে সামঞ্জস্য থাকার দরুন وَمَآ أُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ আয়াতের হুকুম দ্বিতীয় আয়াত وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ —এরও প্রতিপাদ্য সাব্যস্ত হওয়ায় এ শ্রেণীর পশুর গোশতও হারাম।

তৃতীয় সুরত হচ্ছে পশুর কান কেটে অথবা শরীরের অন্য কোথাও কোন চিহ্ন অঙ্কিত করে কোন দেব-দেবী বা পীর-ফকীরের নামে ছেড়ে

দেয়া হয়। সেগুলো দ্বারা কোন কাজ নেয়া হয় না, যবেহ করাও উদ্দেশ্য থাকে না। বরং যবেহ করাকে হারাম মনে করে। এ শ্রেণীর পশু আলোচ্য দু'আয়াতের কোনটিরই আওতায় পড়ে না। এ শ্রেণীর পশুকে কোরআনের ভাষায় 'বহীরা' বা 'সায়েবা' নামে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের পশু সম্পর্কে হুকুম হচ্ছে যে, এ ধরনের কাজ অর্থাৎ, কারো নামে কোন পশু প্রভৃতি জীবন্ত উৎসর্গ করে ছেড়ে দেয়া কোরআনের সরাসরি নির্দেশ অনুযায়ী হারাম। যেমন বলা হয়েছেঃ

مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِنْ بَحِيْرَةٍ وَّلَا سَآئِبَةٍ

"আল্লাহ্ তাআলা বাহীরা বা 'সায়েবা' সম্পর্কে কোন বিধান দেননি। তবে এ ধরনের হারাম আমল কিংবা সংশ্লিষ্ট পশুটিকে হারাম মনে করার ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণেই সেটি হারাম হয়ে যাবে না। বরং হারাম মনে করাতেই তাদের একটা বাতিল মতবাদকে সমর্থন এবং শক্তি প্রদান করা হয়। তাই এরূপ উৎসর্গকৃত পশু অন্যান্য সাধারণ পশুর মতই হালাল।"

শরীয়তের বিধান অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট পশুর উপর তার মালিকের মালিকানা বিনষ্ট হয় না, যদিও সে ভ্রান্ত বিশ্বাসের ভিত্তিতে এরূপ মনে করে যে, এটি আমার মালিকানা থেকে বের হয়ে যে নামে উৎসর্গ করা হয়েছে তারই মালিকানায় পরিণত হয়েছে। কিন্তু শরীয়তের বিধানমতে যেহেতু তার সে উৎসর্গীকরণই বাতিল, সুতরাং সে পশুর উপর তারই পরিপূর্ণ মালিকানা কায়েম থাকে। সে মতে উৎসর্গকারী যদি সে পশু কারো নিকট বিক্রয় করে কিংবা অন্য কাউকে দান করে, তবে তা ক্রেতা ও দানগ্রহীতার জন্য হালাল। পৌত্তলিক সমাজের অনেকেই মন্দির বা দেব-দেবীর নামে পশু-পাখী উৎসর্গ করে সেগুলো পূজারী বা সেবায়েতদের হাতে তুলে দেয়। সেবায়েতরা সেসব পশু বিক্রয় করে থাকে। এরূপ পশু ক্রয় করা সম্পূর্ণ হালাল।

এক শ্রেণীর কুসংস্কারগ্রস্ত মুসলমানকেও পীর-বুযুর্গের মাজারে ছাগল-মুরগী ইত্যাদি ছেড়ে আসতে দেখা যায়। মাযারের খাদেমরাই সাধারণতঃ উৎসর্গীকৃত সেসব জন্তু ভোগ-দখল করে। যেহেতু মূল মালিক খাদেমদের হাতে এগুলো ছেড়ে যায় এবং এগুলোর ব্যাপারে খাদেমদের পূর্ণ এখতিয়ার থাকে, সেহেতু এ শ্রেণীর জীব-জন্তু ক্রয় করা, যবেহ করে খাওয়া, বিক্রয় করে লাভবান হওয়া সম্পূর্ণ হালাল।

গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ এ ক্ষেত্রে কোরআন করীম মরণাপন্ন অবস্থায়ও হারাম বস্তু খাওয়াকে হালাল বা বৈধ বলেনি; বলেছে فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ "তাতে তার কোন পাপ নেই"। এর মর্ম এই যে, সেসব বস্তু তখনও যথারীতি হারামই রয়ে গেছে, কিন্তু যে লোক খাচ্ছে তার অনন্যোপায় অবস্থার প্রেক্ষিতে হারাম খাদ্য গ্রহণের পাপ থেকে তাকে ব্যাহতি দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য আয়াতের দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, যে ব্যক্তি ধন-সম্পদের লোভে শরীয়তের হুকুম-আহ্কাম পরিবর্তিত করে এবং তার বিনিময়ে যে হারাম ধন-সম্পদ গ্রহণ করে, তা যেন সে নিজের পেটে জাহান্নামের আগুন ভরে। কারণ, এ কাজের পরিণতি তাই। কোন কোন বিজ্ঞ আলেমের মতে প্রকৃতপক্ষে হারাম মাল বা ধন-সম্পদ সবই দোযখের আগুন। অবশ্য তা যে আগুন, সে-কথা পার্থিব জীবনে উপলব্ধি করা যায় না, কিন্তু মৃত্যুর পর তার সে কর্মই আগুনের রূপ ধরে উপস্থিত হবে।

মুসলমানদের কেবলা যখন বায়তুল-মোকাদ্দাসের দিক থেকে পরিবর্তিত করে বায়তুল্লাহ্র দিকে নির্ধারণ করা হলো, তখন ইহুদী, খ্রীষ্টান, পৌত্তলিক প্রভৃতি যারা সর্বদা মুসলমানদের মধ্যে ত্রুটি তালাশ করার ফিকিরে থাকতো, তারা তৎপর হয়ে উঠলো এবং নানাভাবে রসূলুল্লাহ (সাঃ) ও ইসলামের প্রতি অবিরাম নানা প্রশ্নবাণ নিক্ষেপ করতে শুরু করল। এসব প্রশ্নের জবাব পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে দেয়া হয়েছে।

আলোচ্য একটি আয়াতে বিশেষ বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে এ বিতর্কের যতি টেনে দেয়া হয়েছে। যার সারমর্ম হচ্ছে এই যে, নামাযে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়াতে হবে কি পশ্চিমদিকে, এ বিষয় নির্ধারণকেই যেন তোমরা দ্বীনের একমাত্র লক্ষ্য স্থির করে নিয়েছ এবং এ ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করেই তোমাদের যাবতীয় আলোচনা-সমালোচনা আবর্তিত হতে শুরু করেছে। মনে হয়, তোমাদের ধারণায় শরীয়তের অন্য কোন হুকুম-আহ্কামই যেন আর নেই।

অন্য অর্থে এ আয়াতের লক্ষ্য মুসলমান, ইহুদী, নাসারা নির্বিশেষে সবাই হতে পারে। এমতাবস্থায় আয়াতের অর্থ দাঁড়াবে এই যে, প্রকৃত পুণ্য বা নেকী আল্লাহ্ তাআলার আনুগত্যের ভেতরেই নিহিত। যেদিকে মুখ করে তিনি নামাযে দাঁড়াতে নির্দেশ দেন, সেটাই শুদ্ধ ও পুণ্যের কাজে পরিণত হয়ে যায়। অন্যথায়, দিক হিসাবে পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের কোনই বৈশিষ্ট্য নেই। দিকবিশেষের সাথে কোন পুণ্যও সংশ্লিষ্ট নয়। পুণ্য-একান্তভাবেই আল্লাহ্র প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের সাথে সম্পৃক্ত। তাই আল্লাহ্ তাআলা যতদিন বায়তুল মোকাদ্দাসের প্রতি মুখ করে নামায পড়তে নির্দেশ দিয়েছেন, ততদিন সেদিকে মুখ করাই ছিল পুণ্য। আবার যখন মসজিদুল হারামের দিকে মুখ করে দাঁড়ানোর হুকুম হয়েছে, এখন এ হুকুমের আনুগত্য করাই পুণ্যে পরিণত হয়েছে।

আলোচ্য ১৭৭ তম আয়াত থেকে সূরা-বাক্বারার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হচ্ছে। এ অধ্যায়ে মুসলমানদের জন্য বিভিন্ন বিষয়ে তা'লীম ও হেদায়েত প্রদানই মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রসঙ্গতঃ এতে বিরুদ্ধবাদীদের উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবও দেয়া হয়েছে। সে হিসেবে আলোচ্য এ আয়াতটিকে ইসলামের বিধি-বিধান বর্ণনার ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও ব্যাপক অর্থবহ আয়াত বলে অভিহিত করা যায়।

অতঃপর সূরার শেষ পর্যন্ত বিভিন্নভাবে এ আয়াতেরই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। আলোচ্য এ আয়াতে এ'তেকাদ বা বিশ্বাস, এবাদত, মোআমালাত বা লেনদেন এবং নৈতিকতা ও আখলাক সম্পর্কিত বিধি-বিধানের মূলনীতিসমূহের আলোচনা মোটামুটিভাবে এসে গেছে। প্রথম বিষয় — ই'তেকাদ বা মৌলবিশ্বাস সম্পর্কিত আলোচনা مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ শীর্ষক আয়াতে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবাদত এবং মোআমালাত সম্পর্কিত। তার মধ্যে এবাদত সম্পর্কিত আলোচনা وَاٰتَى الزَّكٰوةَ পর্যন্ত উল্লেখিত হয়েছে। অতঃপর মোআমালাতের আলোচনা وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ শীর্ষক আয়াতে করা হয়েছে। এরপর আখলাক সম্পর্কিত আলোচনা وَالصّٰبِرِيْنَ থেকে বর্ণিত হয়েছে।

সবশেষে বলা হয়েছে যে, সে সমস্ত লোকই সত্যিকার মুমিন, যারা এসব নির্দেশাবলীর পরিপূর্ণ অনুসরণ করে এবং এসব লোককেই প্রকৃত মোত্তাকী বলা যেতে পারে।

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে প্রথমে ধন-সম্পদ ব্যয় করার দুটি গুরু

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلٰى ؕ اَلْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاُنْثٰى بِالْاُنْثٰى ؕ فَمَنْ عُفِيَ لَهٗ مِنْ اَخِيْهِ
شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌۢ بِالْمَعْرُوْفِ وَاَدَآءٌ اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ ؕ ذٰلِكَ تَخْفِيْفٌ مِّنْ
رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ؕ فَمَنِ اعْتَدٰى بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهٗ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿١٧٨﴾ وَ
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يّٰۤاُولِي الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٩﴾
كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرَا ۖۚ ۨالْوَصِيَّةُ
لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٨٠﴾ فَمَنْۢ
بَدَّلَهٗ بَعْدَ مَا سَمِعَهٗ فَاِنَّمَآ اِثْمُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهٗ ؕ
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿١٨١﴾ فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا
فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ؕ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٨٢﴾ يٰۤاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿١٨٣﴾ اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ ؕ فَمَنْ كَانَ
مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ؕ وَعَلَى
الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ ؕ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا
فَهُوَ خَيْرٌ لَّهٗ ؕ وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٤﴾

(১৭৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি নিহতদের ব্যাপারে কেসাস গ্রহণ করা বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। স্বাধীন ব্যক্তি স্বাধীন ব্যক্তির বদলায়, দাস দাসের বদলায় এবং নারী নারীর বদলায়। অতঃপর তার ভাইয়ের তরফ থেকে যদি কাউকে কিছুটা মাফ করে দেয়া হয়, তবে প্রচলিত নিয়মের অনুসরণ করবে এবং ভালভাবে তাকে তা প্রদান করতে হবে। এটা তোমাদের পালনকর্তার তরফ থেকে সহজ এবং বিশেষ অনুগ্রহ। এরপরও যে ব্যক্তি বাড়াবাড়ি করে, তার জন্য রয়েছে বেদনাদায়ক আযাব। (১৭৯) হে বুদ্ধিমানগণ! কেসাসের মধ্যে তোমাদের জন্যে জীবন রয়েছে, যাতে তোমরা সাবধান হতে পার। (১৮০) তোমাদের কারো যখন মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয়, সে যদি কিছু ধন-সম্পদ ত্যাগ করে যায়, তবে তার জন্য ওসীয়ত করা বিধিবদ্ধ করা হলো, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের জন্য ইনসাফের সাথে। পরহেযগারদের জন্য এ নির্দেশ জরুরী। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সবকিছু শোনেন ও জানেন। (১৮১) যদি কেউ ওসীয়ত শোনার পর তাতে কোন রকম পরিবর্তন সাধন করে, তবে যারা পরিবর্তন করে তাদের উপর এর পাপ পতিত হবে। (১৮২) যদি কেউ ওসীয়তকারীর পক্ষ থেকে আশংকা করে পক্ষপাতিত্বের অথবা কোন অপরাধমূলক সিদ্ধান্তের এবং তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেয়, তবে তার কোন গোনাহ্ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা ক্ষমাশীল, অতি দয়ালু। (১৮৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর রোযা ফরয করা হয়েছে, যেরূপ ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর, যেন তোমরা পরহেযগারী অর্জন করতে পার— (১৮৪) গণনার কয়েকটি দিনের জন্য। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে অসুস্থ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোযা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে। যে ব্যক্তি খুশীর সাথে সৎকর্ম করে, তা তার জন্য কল্যাণকর হয়। আর যদি রোযা রাখ, তবে তা তোমাদের জন্যে বিশেষ কল্যাণকর, যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

ত্বপূর্ণ খাত বর্ণনা করে পরে যাকাতের কথা বলা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, এ দুটি খাত যাকাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রথমেই এ দু'টি খাতের কথা বর্ণনা করার পরে যাকাতের কথা বর্ণনা করার উদ্দেশ্য এমনও হতে পারে যে, সাধারণতঃ মানুষ আলোচ্য দু'টি খাতে অর্থ ব্যয় করার ব্যাপারে কুন্ঠাবোধ করে, কিন্তু তা উচিত নয়।

মাসআলা ঃ এ আয়াতের বর্ণনাভঙ্গির দ্বারাই এ তথ্যও সাব্যস্ত হয়ে যায় যে, ধন-সম্পদের ফরয শুধুমাত্র যাকাত প্রদানের মাধ্যমেই পূর্ণ হয় না, যাকাত ছাড়া আরোও বহু ক্ষেত্রে সম্পদ ব্যয় করা ফরয ও ওয়াজিব হয়ে থাকে।— (জাস্সাস, কুরতুবী)।

যেমন, রুযী-রোযগারে অক্ষম আত্মীয়-স্বজনের ব্যয়ভার বহন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। কারো সামনে যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তির জীবন বিপন্ন হয়, তবে যাকাত প্রদান কারার পরেও সে দরিদ্রের জীবন রক্ষার্থ অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা ফরয হয়ে পড়ে।

অনুরূপ, যেসব স্থানে প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে মসজিদ তৈরী করা এবং দ্বিনী-শিক্ষার জন্য মক্তব-মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করাও আর্থিক ফরযের অন্তর্গত। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, যাকাতের একটা বিশেষ বিধান রয়েছে, সে বিধান অনুযায়ী যে কোন অবস্থায় যাকাত প্রদান করতে হবে, কিন্তু অন্যান্য খরচের বেলায় প্রয়োজন দেখা দেয়া শর্ত।

অতঃপর পূর্ববর্তী বর্ণনাভঙ্গি পরিবর্তন করে অতীতকাল বাচক শব্দের স্থলে وَالْمُوْفُوْنَ بِعَهْدِهِمْ বাক্যটিতে কারক পদ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মুমিন ব্যক্তির মধ্যে ওয়াদা-অঙ্গীকার পূর্ণ করার অভ্যাস সব সময়ের জন্য থাকতে হবে, ঘটনাচক্রে কখনো কখনো অঙ্গীকার পূরণ করলে চলবে না। কেননা, এরূপ মাঝে-মধ্যে কাফের-গোনাহ্গাররাও ওয়াদা- অঙ্গীকার পূরণ করে থাকে। সুতরাং এটা ধর্তব্যের মধ্যে আসবে না।

তেমনিভাবে মোআমালাতের বর্ণনায় শুধুমাত্র অঙ্গীকার পূরণ করার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় যে, ক্রয়-বিক্রয়, অংশীদারিত্ব, ভাড়া-ইজারা প্রভৃতি বৈষয়িক দিকসমূহের সুষ্ঠুতা ও পবিত্রতাই অঙ্গীকার পূরণের উপর নির্ভরশীল।

এরপরই আখলাক বা মন-মানসিকতার সুস্থতা বিধান সম্পর্কিত বিধি-বিধানের আলোচনায় একমাত্র 'সবর'-এর উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা, সবর-এর অর্থ হচ্ছে মন-মানসিকতা তথা নফসকে বশীভূত করে অন্যায়-অনাচার থেকে সর্বতোভাবে সুরক্ষিত রাখা। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যাবে যে, মানুষের হৃদয়-বৃত্তিসহ আভ্যন্তরীণ যত আমল রয়েছে, সবরই সেসবের প্রাণস্বরূপ। এরই মাধ্যমে সর্বপ্রকার অন্যায় ও কদাচার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ হয়।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَلْقِصَاصُ 'কেসাসুন'-এর শাব্দিক অর্থ সমপরিমাণ বা অনুরূপ। অর্থাৎ, অন্যের প্রতি যতটুকু জুলুম করা হয়েছে, তার সমপরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ তার পক্ষে জায়েয। এর চাইতে বেশীকিছু করা জায়েয নয়। এ সূরারই পরবর্তী এক আয়াতে এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ

فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

অনুরূপ সূরা নহলের শেষ আয়াতে রয়েছে ঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبْتُمْ بِهٖ

এতে আলোচ্য বিষয়ই আরো বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে। সেমতে শরীয়তের পরিভাষায় 'কেসাস' বলা হয় হত্যা এবং আঘাতের সে শাস্তিকে, যা সমতা ও পরিমাণের প্রতি লক্ষ্য রেখে বিধান করা হয়।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যা বলা হয় কোন অস্ত্র কিংবা এমন কোন কিছুর দ্বারা হত্যার উদ্দেশে আঘাত করা, যার দ্বারা রক্ত প্রবাহিত হয় অথবা হত্যা সংঘটিত হয়— 'কেসাস' অর্থাৎ, 'জানের বদলায় জান' এ ধরনের হত্যার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

মাসআলা ঃ এ ধরনের হত্যার অপরাধে যেমন স্বাধীন ব্যক্তির হত্যাকারী অন্য স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তেমনি কোন ক্রীতদাসের বদলায়ও স্বাধীন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হবে। অনুরূপ স্ত্রীলোক হত্যার অপরাধে পুরুষকে এবং পুরুষ হত্যার অপরাধে স্ত্রীলোককেও মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে।

এ আয়াতে স্বাধীন ব্যক্তির বদলায় স্বাধীন ব্যক্তি এবং স্ত্রীলোকের বদলায় স্ত্রী লোককে মৃত্যুদণ্ড দেয়ার যে কথা উল্লেখিত হয়েছে, তা সেই একটা বিশেষ ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করেই বলা হয়েছে, যে ঘটনার প্রেক্ষিতে এ আয়াতটি নাযিল হয়।

মাসআলা ঃ ইচ্ছাকৃত হত্যার ক্ষেত্রে যদি হত্যাকারীকে সম্পূর্ণ মাফ করে দেয়া হয়, — যেমন নিহত ব্যক্তির ওয়ারিস মাত্র দুই পুত্র, সে দুজনেই যদি মাফ করে দেয়, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারীর উপর কোন কিছু ওয়াজিব হবে না। সে ব্যক্তি সম্পূর্ণ মুক্ত হয়ে যাবে। কিন্তু যদি পূর্ণ মাফ না হয়, অর্থাৎ, উপরোক্ত ক্ষেত্রে এক পুত্র মাফ করে, কিন্তু অপর পুত্র তা না করে, তবে এমতাবস্থায় হত্যাকারী কেসাস- এর দণ্ড থেকে অব্যাহতি পাবে সত্য, কিন্তু এক পুত্রের দাবীর বদলায় অর্ধেক দিয়্যত প্রদান করতে হবে।

শরীয়তের বিধানে হত্যার বদলায় যে দিয়্যত বা অর্থদণ্ড প্রদান করতে হয়, তার পরিমাণ হচ্ছে মধ্যম আকৃতির একশ' উট, অথবা একহাজার দীনার কিংবা দশ হাজার দেরহাম। বর্তমানকালের প্রচলিত ওজন অনুপাতে এক দেরহাম—সাড়ে তিন মাসা রৌপ্যের সমপরিমাণ। সেমতে পূর্ণ দিয়্যত–এর পরিমাণ হবে দু'হাজার নয়শ' তোলা আট মাসা রৌপ্য।

মাসআলা ঃ কেসাস-এর আংশিক দাবী মাফ হয়ে গেলে যেমন মৃত্যুদণ্ড মওকুফ হয়ে দিয়্যত ওয়াজিব হয়, তেমনি উভয়পক্ষ যদি কোন নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রদানের শর্তে আপোষ-নিষ্পত্তি করে ফেলে, তবে সে অবস্থাতেও , 'কেসাস' মওকুফ হয়ে অর্থ প্রদান করা ওয়াজিব হবে। তবে এ ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে, যা ফেকাহ্‌র কিতাবসমূহে বিস্তারিতভাবে উল্লেখিত হয়েছে।

মাসআলা ঃ নিহত ব্যক্তির যে ক'জন ওয়ারিস্ থাকবে, তাদের প্রত্যেকেই 'মীরাস'–এর অংশ অনুপাতে 'কেসাস' ও দিয়্যত-এর মালিক হবে এবং দিয়্যত হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ 'মীরাস'–এর অংশ অনুপাতে বন্টিত হবে। তবে কেসাস যেহেতু বন্টনযোগ্য নয়, সেহেতু ওয়ারিসগণের মধ্য থেকে যে কোন একজনও যদি কেসাস-এর দাবী ত্যাগ করে, তবে তার উপর কেসাস ওয়াজিব হবে না; বরং দিয়্যত ওয়াজিব হবে এবং প্রত্যেকেই অংশ অনুযায়ী দিয়্যতের ভাগ পাবে।

মাসআলা ঃ 'কেসাস' গ্রহণ করার অধিকার যদিও নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারিগণের, তথাপি নিজেরা সে অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না। অর্থাৎ, নিহত ব্যক্তির বদলায় হত্যাকারীকে তারা নিজেরা হত্যা করতে পারবে না। এ অধিকার আদায় করার জন্য আইন কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কেননা, কোন্ অবস্থায় কেসাস ওয়াজিব হয় এবং কোন্ অবস্থায় হয় না, এ সম্পর্কিত অনেক সূক্ষ্ম দিকও রয়েছে, যা সবার পক্ষে নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীরা রাগের মাথায় বাড়াবাড়িও করে ফেলতে পারে, এজন্য আলেম ও ফেকাহ্‌বিদগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী 'কেসাস'–এর হক আদায় করার জন্য ইসলামী আদালতের শরণাপন্ন হতে হবে।— (কুরতুবী)

১৮০ নং আয়াতে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রতি (যদি সে কিছু ধন-সম্পদ রেখে যায়,) যে ওসীয়ত ফরয করা হয়েছে, সে নির্দেশের তিনটি অংশ বর্ণিত হয়েছে

(এক) মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে সন্তান-সন্ততি ছাড়া অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের কোন অংশ যেহেতু নির্ধারিত নেই, সুতরাং তাদের হক মৃত ব্যক্তির ওসীয়তের মাধ্যমে নির্ধারিত হবে।

(দুই) এ ধরনের নিকাটাত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির উপর ফরয।

(তিন) এক তৃতীয়াংশ সম্পত্তির বেশী ওসীয়ত করা জায়েয নয়।

উপরোক্ত তিনটি নির্দেশের মধ্যে প্রথম নির্দেশটি অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়িগণের মতে 'মীরাস'–এর আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর 'মনসূখ' বা রহিত হয়ে গেছে। ইবনে-কাসীর ও হাকেম প্রমুখ সহীহ্ সনদের সাথে বর্ণনা করেন যে, হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর মতে ওসীয়ত-সম্পর্কিত এ নির্দেশটি মীরাস-এর আয়াত দ্বারা রহিত করে দেয়া হয়েছে। মীরাস-সম্পর্কিত আয়াতটি হচ্ছেঃ

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ)–এর অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, মীরাসের আয়াত সে মসস্ত আত্মীয়দের জন্য ওসীয়ত করা রহিত করে দিয়েছে, যাদের মীরাস নির্ধারিত ছিল। এছাড়া অন্যান্য যেসব আত্মীয়ের অংশ মীরাসের আয়াতে নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করার হুকুম এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।— (জাসসাস, কুরতুবী)

তবে আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত হচ্ছে, যেসব আত্মীয়ের জন্য মীরাসের আয়াতে কোন অংশ নির্ধারণ করা হয়নি, তাদের জন্য ওসীয়ত করা মৃত্যুপথযাত্রীর পক্ষে ফরয বা জরুরী নয়। সে ফরয রহিত হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজনবিশেষে এটা মুস্তাহাবে পরিণত হয়েছে। – (জাস্‌সাস, কুরতুবী)

ওসীয়ত ফরয হওয়া প্রসঙ্গে ঃ ওসীয়ত সম্পর্কিত এ আয়াতের নির্দেশ একাধারে যেমন কোরআনের মীরাস-সম্পর্কিত আয়াত দ্বারা রহিত করা হয়েছে, তেমনি বিদায় হজ্বের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ) কর্তৃক ঘোষিত নির্দেশের মাধ্যমেও হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। বিদায় হজ্বের বিখ্যাত খোতবায় রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছিলেনঃ

ان الله اعطى لكل ذى حق حقه فلا وصية لوارث

اخرجه الترمذى وقال هذا حديث حسن

"আল্লাহ্ তাআলা প্রত্যেক হকদারের হক নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং এখন থেকে কোন ওয়ারিসের পক্ষে ওসীয়ত করা জায়েয নয়।— (তিরমিযী)

একই হাদীসে হযরত ইবনে আব্বাসের বর্ণনায় একথাও যুক্ত হয়েছেঃ

لاوصية لوارث الا ان تجيزه الورثة

"কোন ওয়ারিসের জন্য সে পর্যন্ত ওসীয়ত জায়েয হবে না, যে পর্যন্ত অন্যান্য ওরারিসগণ অনুমতি না দেয়।" – (জাস্সাস)

হাদীসের মূল বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আল্লাহ্ তাআলাই যেহেতু প্রত্যেক ওয়ারিসের হিস্সা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, সুতরাং এখন আর ওসীয়ত করার অনুমতি নেই। তবে যদি অন্যান্য ওয়ারিসগণ ওসীয়ত করার অনুমতি দেন, তবে যে কোন ওরারিসের জন্য বিশেষভাবে কোন ওসীয়ত করা জায়েয হবে।

তৃতীয় নির্দেশ ঃ এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের ওসীয়ত সম্পর্কে ঃ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত অনুযায়ী মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তিগণের পক্ষে এখনো তাদের মোট সম্পদের এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণ ওসীয়ত করা জায়েয। এমনকি উত্তরাধীকারীগণের অনুমতিক্রমে সমগ্র সম্পত্তিও ওসীয়ত করা জায়েয এবং গ্রহণযোগ্য।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত বর্ণনার ভিত্তিতে সাব্যস্ত হচ্ছে যে, যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন করীম নির্ধারণ করে দিয়েছে, তাদের জন্যে ওসীয়ত করা ওয়াজিব নয়। এমনকি ওয়ারিসগণের অনুমতি ব্যতীত এক- তৃতীয়াংশ সম্পদের অতিরিক্ত ওসীয়ত করা জায়েযই নয়। তবে যেসব আত্মীয়ের হিস্সা কোরআন নির্ধারণ করেনি, তাদের জন্য মোট সম্পত্তির এক- তৃতীয়াংশ পরিমাণের মধ্যে ওসীয়ত করার অনুমতি রয়েছে।

মাসআলা ঃ যদি কোন ব্যক্তির উপর অন্যের ঋণ বা আমানত থাকে এবং তা পরিশোধ করার জন্যে তার সমগ্র সম্পত্তির ওসীয়ত করতে হয়, তবুও তার পক্ষে তা করতে হবে এবং সমস্ত সম্পত্তির ওসীয়তই বৈধ হবে। রসূলুল্লাহ (সাঃ) এরশাদ করেছেন, — কারো উপর অন্যের হক থাকলে তার পক্ষে সে সম্পর্কে লিখিত ওসীয়ত করা ব্যতীত তিনটি রাতও কাটানো উচিত নয়।

মাসআলা ঃ এক- তৃতীয়াংশ সম্পত্তিতে ওসীয়ত করার যে অধিকার দেয়া হয়েছে, সেরূপ ওসীয়ত করার পর জীবিতাবস্থায় তা পরিবর্তন কিংবা বাতিল করে দেয়ারও অধিকার রয়েছে।— (জাস্সাস)

صوم -এর শাব্দিক অর্থ বিরত থাকা। শরীয়তের পরিভাষায় পানাহার এবং স্ত্রী সহবাস থেকে বিরত থাকার নাম 'সওম'। তবে সুবহে সাদেক উদয় হওয়ার পূর্ব থেকে শুরু করে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোযার নিয়তে একাধারে এ ভাবে বিরত থাকলেই তা রোযা বলে গণ্য হবে। সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেও যদি কোন কিছু খেয়ে ফেলে, পান করে, কিংবা সহবাস করে, তবে রোযা হবে না। অনুরূপ উপায়ে সবকিছু থেকে পূর্ণ দিবস বিরত থাকার পরও যদি রোযার নিয়ত না থাকে, তবে তাও রোযা হবে না।

সওম বা রোযা ইসলামের মূলভিত্তি বা আরকানের অন্যতম। রোযার অপরিসীম ফযীলত রয়েছে।

পূর্ববর্তী উম্মতের উপর রোযার হুকুম ঃ মুসলমানদের প্রতি রোযা ফরয হওয়ার নির্দেশটি একটি বিশেষ নযীর উল্লেখসহ দেয়া হয়েছে। নির্দেশের সাথে সাথে এটাও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রোযা শুধুমাত্র তোমাদের প্রতিই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল। এর দ্বারা যেমন রোযার বিশেষ গুরুত্ব বুঝানো হয়েছে, তেমনি মুসলমানদের এ মর্মে একটা সান্ত্বনাও দেয়া হয়েছে যে, রোযা একটা কষ্টকর এবাদত সত্য, তবে তা শুধুমাত্র তোমাদের উপরই ফরয করা হয়নি, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলোর উপরও ফরয করা হয়েছিল। কেননা, সাধারণতঃ দেখা যায়, কোন একটা ক্লেশকর কাজে অনেক লোক একই সাথে জড়িত হয়ে পড়লে তা অনেকটা স্বাভাবিক এবং সাধারণ বলে মনে হয়।— (রুহুল-মা'আনী)

কোরআনের বাক্য وَالَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ অর্থাৎ, যারা তোমাদের পূর্বে ছিল, — ব্যাপক অর্থবোধক। এর দ্বারা হযরত আদম (আঃ) থেকে শুরু করে হযরত ঈসা (আঃ) পর্যন্ত সকল উম্মত এবং শরীয়তকেই বোঝায়। এতে বোঝা যায় যে, নামাযের এবাদত থেকে যেমন কোন উম্মত বা শরীয়তই বাদ ছিল না, তেমনি রোযাও সবার জন্যই ফরয ছিল।

যাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, مِنْ قَبْلِكُمْ বাক্য দ্বারা পূর্ববর্তী উম্মত 'নাসারা'দের বুঝানো হয়েছে, তাঁরা বলেন — এটা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে; অন্যান্য উম্মতের উপর রোযা ফরয ছিল না, তাঁদের কথায় এ তথ্য বোঝায় না।— (রুহুল-মা'আনী)

আয়াতের মধ্যে শুধু বলা হয়েছে যে, — 'রোযা যেমন মুসলমানদের উপর ফরয করা হয়েছে, তেমনি পূর্ববর্তী উম্মতগণের উপরও ফরয করা হয়েছিল'; একথা দ্বারা এ তথ্য বুঝায় না যে, আগেকার উম্মতগণের রোযা সমগ্র শর্ত ও প্রকৃতির দিক দিয়ে মুসলমানদের উপর ফরযকৃত রোযারই অনুরূপ ছিল। যেমন, রোযার সময়সীমা, সংখ্যা এবং কখন তা রাখা হবে, এসব ব্যাপারে আগেকার উম্মতদের রোযার সাথে মুসলমানদের রোযার পার্থক্য হতে পারে, বাস্তব ক্ষেত্রে হয়েছেও তাই। বিভিন্ন সময়ে রোযার সময়সীমা এবং সংখ্যার ক্ষেত্রে পার্থক্য হয়েছে।— (রুহুল- মা'আনী)

لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ বাক্যে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর শক্তি অর্জন করার ব্যাপারে রোযার একটা বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান। কেননা, রোযার মাধ্যমে প্রবৃত্তির তাড়না নিয়ন্ত্রণ করার ব্যাপারে বিশেষ শক্তি অর্জিত হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে সেটাই 'তাকওয়া' বা পরহেযগারীর ভিত্তি।

রুগ্ন ব্যক্তির রোযা ঃ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا বাক্যে উল্লেখিত 'রুগ্ন' সে ব্যক্তিকে বোঝায়, রোযা রাখতে যার কঠিন কষ্ট হয় অথবা রোগ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। পরবর্তী আয়াত وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ -এর মধ্যে সে দিকেই ইশারা করা হয়েছে। ফেকাহ্বিদ আলেমগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।

মুসাফেরের রোযাঃ আয়াতের অংশ اَوْعَلٰى سَفَرٍ -এর মধ্যে مسافر না বলে عَلٰى سَفَرٍ শব্দ ব্যবহার করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

প্রথমতঃ শুধুমাত্র আভিধানিক অর্থের সফর যথা, বাড়ীঘর থেকে বের হয়ে কোথাও গেলেই রোযার ব্যাপারে সফর-জনিত 'রুখসত' তথা অব্যাহতি পাওয়া যাবে না; সফর দীর্ঘ হতে হবে। কেননা, عَلٰى سَفَرٍ

শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে, যে সফরের অবস্থায় থাকে। এতে বোঝা যায় যে, বাড়ীঘর থেকে পাঁচ-দশ মাইল দূরে গেলেই তা সফর বলে গণ্য হবে না। তবে সফর কতটুকু দীর্ঘ হতে হবে, সে সীমারেখা কোরআনে উল্লেখিত হয়নি। রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর হাদীস এবং সাহাবিগণের আমলের উপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানীফা (রাহঃ) এবং অন্যান্য কিছুসংখ্যক ফেকাহ্‌বিদের মতে এ সফর কমপক্ষে তিন মন্‌যিল দূরত্বের হতে হবে। অর্থাৎ, একজন লোক স্বাভাবিকভাবে পায়ে হেঁটে তিন দিনে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে, ততটুকু দূরত্বের সফরকে সফর বলে উল্লেখ করেছেন। পরবর্তী যুগের আলেমগণ 'মাইল'-এর হিসাবে এ দূরত্ব আটচল্লিশ মাইল নির্ধারণ করেছেন।

দ্বিতীয় মাসআলা ঃ عَلٰى سَفَرٍ শব্দ দ্বারা একথাও বোঝা যায় যে, মুসাফির, এর প্রতি রোযার ব্যাপারে সফরজনিত 'রুখসত' ততক্ষণই প্রযোজ্য হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সফর অবস্থায় থাকে। তবে স্বভাবতঃই সফর চলা অবস্থায় কোথাও সাময়িক যাত্রাবিরতি সফরের ধারাবাহিকতার সমাপ্তি ঘটায় না। নবী করীম (সাঃ)-এর হাদীস মতে এ যাত্রাবিরতির মেয়াদ উর্ধ্বপক্ষে পনের দিনের কম সময় হতে হবে। কেউ যদি সফরের মধ্যেই কোথাও পনের দিন অবস্থান করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে সে আর 'সফরের মধ্যে' থাকে না। ফলে সে ব্যক্তির ক্ষেত্রে সফরজনিত 'রুখসত' ও প্রযোজ্য হবে না।

মাসআলা ঃ উল্লেখিত বাক্যাংশ দ্বারা একথাও বোঝায় যে, কেউ যদি সফরের মধ্যে কোন এক জায়গায় নয়; বরং বিভিন্ন জায়গায় মোট পনের দিনের যাত্রাবিরতি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে তার সফরের ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। সে সফর-জনিত রুখসত পাওয়ার অধিকারী হবে।

রোযার কাযা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ অর্থাৎ, রুগ্ন বা মুসাফির ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরে যে কয়টি রোযা রাখতে পারবে না, সেগুলো অন্য সময় হিসাব করে কাযা করা ওয়াজিব। এতে বলা উদ্দেশ্য ছিল যে, রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের অসুবিধায় পতিত হয়ে যে ক'টি রোযা ভাঙতে হয়েছে, সে ক'টি রোযা অন্য সময় পূরণ করে নেয়া তাদের উপর ওয়াজিব। এ কথাটি বোঝানোর জন্যে فعليه القضاء "তার উপর কাযা ওয়াজিব," এতটুকু বলাই যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তা না বলে فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, রুগ্ন এবং মুসাফিরদের অপরিহার্য রোযার মধ্যে শুধু সে পরিমাণ রোযার কাযা করাই ওয়াজিব, রুগী সুস্থ হওয়ার পর এবং মুসাফির বাড়ী ফেরার পর যে কয় দিনের সুযোগ পাবে। কিন্তু সে ব্যক্তি যদি এতটুকু সময় না পায় এবং এর আগেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার উপর কাযা কিংবা 'ফিদ্‌ইয়া'র জন্য ওসীয়ত করা জরুরী নয়।

মাসআলা ঃ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ বাক্যে যেহেতু এমন কোন শর্তের উল্লেখ নেই, যদ্দারা বোঝা যেতে পারে যে, এ রোযা একই সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে রাখতে হবে, না মাঝে মাঝে বিরতি দিয়ে রাখলেও চলবে, সুতরাং যার রমযানের প্রথম দশ দিনের রোযা ফউত হয়েছে সে যদি প্রথমে দশ তারিখের কাযা করে, পরে নয় তারিখের, তারপর আট তারিখের কাযা হিসাবে করতে থাকে, তবে তাতে কোন অসুবিধা হবে না। অনুরূপভাবে দশটি রোযার মধ্যে দু'চারটি করার পর বিরতি দিয়ে দিয়ে অবশিষ্টগুলো কাযা করলেও কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, আয়াতের মধ্যে এরূপভাবে কাযা করার ব্যাপারেও কোন নিষেধাজ্ঞা উল্লেখিত হয়নি।

রোযার ফিদ্‌ইয়া ঃ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ আয়াতের স্বাভাবিক অর্থ দাঁড়ায়, যেসব লোক রোগজনিত কারণে কিংবা সফরের দরুন নয়; বরং রোযা রাখার পূর্ণ সামর্থ, থাকা সত্ত্বেও রোযা রাখতে চায় না, তাদের জন্যেও রোযা না রেখে রোযার বদলায় 'ফিদ্‌ইয়া' দেয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু সাথে সাথেই এতটুকু বলে দেয়া হয়েছে যে, وَاَنْ تَصُوْمُوْا خَيْرٌ لَّكُمْ অর্থাৎ, রোযা রাখাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর।

উপরোক্ত নির্দেশটি ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের, যখন লক্ষ্য ছিল ধীরে ধীরে লোকজনকে রোযায় অভ্যস্ত করে তোলা। এরপর অবতীর্ণ আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ —এর দ্বারা প্রাথমিক এ নির্দেশ সুস্থ -সবল লোকদের ক্ষেত্রে রহিত করা হয়েছে। তবে যেসব লোক অতিরিক্ত বার্ধক্যজনিত কারণে রোযা রাখতে অপারক কিংবা দীর্ঘকাল রোগ ভোগের দরুন দুর্বল হয়ে পড়েছে, অথবা দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যাপারে একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়েছে, সেসব লোকের বেলায় উপরোক্ত নির্দেশটি এখনো প্রযোজ্য রয়েছে। সাহাবী ও তাবেয়িগণের সর্বসম্মত অভিমত তাই।— (জাসসাস, মাযহারী)

বোখারী মুসলিম, আবু দাউদ, নাসায়ী ও তিরমিযী প্রমুখ হাদীসের সমস্ত ইমামগণই সাহাবী হযরত সালামা – ইবনুল আকওয়া (রাঃ)-এর সে বিখ্যাত হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যাতে বলা হয়েছে যে , যখন وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهٗ শীর্ষক আয়াতটি নাযিল হয়, তখন আমাদেরকে এ মর্মে এখতিয়ার দেয়া হয়েছিল যে, যার ইচ্ছা হয় সে রোযা রাখতে পারে এবং যে রোযা রাখতে না চায়, সে 'ফিদইয়া' দিয়ে দেবে। এরপর যখন পরবর্তী আয়াত فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ নাযিল হলো, তখন 'ফিদইয়া' দেয়ার এখতিয়ার রহিত হয়ে সুস্থ-সমর্থ লোকদের উপর শুধুমাত্র রোযা রাখাই জরুরী সাব্যস্ত হয়ে গেল।

ফিদইয়ার পরিমাণ এবং আনুষঙ্গিক মাসআলা ঃ একটি রোযার ফিদইয়া অর্ধ সা' গম অথবা তার মূল্য। আমাদের দেশে প্রচলিত আশি তোলার সের হিসাবে অর্ধ সা' একসের সাড়ে বার ছটাক হয়। এই পরিমাণ গম অথবা নিকটবর্তী প্রচলিত বাজার দর অনুযায়ী তার মূল্য কোন মিসকীনকে দান করে দিলেই একটি রোযার 'ফিদইয়া' আদায় হয়ে যায়। ফিদইয়া কোন মসজিদ বা মাদ্রাসায় কার্যরত কোন লোকের খেদমতের পারিশ্রমিক হিসেবে দেয়া জায়েয নয়।

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ
بَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ
فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ
يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۖ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿١٨٥﴾ وَاِذَا
سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا
دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ﴿١٨٦﴾
اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلٰى نِسَآئِكُمْ ۗ هُنَّ
لِبَاسٌ لَّكُمْ وَاَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۗ عَلِمَ اللّٰهُ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَانُوْنَ اَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۖ فَالْـٰٔنَ
بَاشِرُوْهُنَّ وَابْتَغُوْا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتّٰى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ۖ
ثُمَّ اَتِمُّوا الصِّيَامَ اِلَى الَّيْلِ ۚ وَلَا تُبَاشِرُوْهُنَّ وَاَنْتُمْ
عٰكِفُوْنَ فِي الْمَسٰجِدِ ۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا ۗ
كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ اٰيٰتِهٖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُوْنَ ﴿١٨٧﴾

(১৮৫) রমযান মাসই হল সে মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে কোরআন, যা মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্যপথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথনির্দেশ আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী। কাজেই তোমাদের মধ্যে যে লোক এ মাসটি পাবে, সে এ মাসের রোযা রাখবে। আর যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে, সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ্ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না— যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর এবং তোমাদের হেদায়েত দান করার দরুন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব বর্ণনা কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর। (১৮৬) আর আমার বান্দারা যখন তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে আমার ব্যাপারে— বস্তুতঃ আমি রয়েছি সন্নিকটে। যারা প্রার্থনা করে, তাদের প্রার্থনা কবুল করে নেই, যখন আমার কাছে প্রার্থনা করে। কাজেই আমার হুকুম মান্য করা এবং আমার প্রতি নিঃসংশয়ে বিশ্বাস করা তাদের একান্ত কর্তব্য। যাতে তারা সৎপথে আসতে পারে। (১৮৭) রোযার রাতে তোমাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস করা তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে। তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ। আল্লাহ্ অবগত রয়েছেন যে, তোমরা আত্মপ্রতারণা করছিলে, সুতরাং তিনি তোমাদেরকে ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের অব্যাহতি দিয়েছেন। অতঃপর তোমরা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে সহবাস কর এবং যাকিছু তোমাদের জন্য আল্লাহ্ দান করেছেন, তা আহরণ কর। আর পানাহার কর যতক্ষণ না কাল রেখা থেকে ভোরের শুভ্র রেখা পরিষ্কার দেখা যায়। অতঃপর রোযা পূর্ণ কর রাত পর্যন্ত। আর যতক্ষণ তোমরা এ'তিকাফ অবস্থায় মসজিদে অবস্থান কর, ততক্ষণ পর্যন্ত স্ত্রীদের সাথে মিশো না। এই হলো আল্লাহ্ কর্তৃক বেঁধে দেয়া সীমানা। অতএব, এর কাছেও যেও না। এমনিভাবে বর্ণনা করেন আল্লাহ্ নিজের আয়াতসমূহ মানুষের জন্য, যাতে তারা বাঁচতে পারে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

اَيَّامًا مَّعْدُوْدٰتٍ বাক্যটি ছিল সংক্ষিপ্ত। তারই ব্যাখ্যা করা হয়েছে এ আয়াতে যে, সে কতিপয় দিন হল রমযান মাসের দিনগুলো। আর এর ফযীলত হলো এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এ মাসটিকে স্বীয় ওহী এবং আসমানী কিতাব নাযিল করার জন্য নির্বাচিত করেছেন। কোরআনও (প্রথম) এ মাসেই অবতীর্ণ হয়েছে। মুসনাদে আহমদ গ্রন্থে হযরত ওয়াসেলা ইবনে আসকা থেকে রেওয়ায়েত করা হয়েছে যে, রসূলে করীম (সাঃ) বলেছেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর সহীফা রমযান মাসের ১লা তারিখে নাযিল হয়েছিল। আর রমযানের ৬ তারিখে তওরাত, ১৩ তারিখে ইঞ্জীল এবং ২৪ তারিখে কোরআন নাযিল হয়েছে। হযরত জাবের (রাঃ)-এর রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে যে, 'যবুর' রমযানের ১২ তারিখে এবং ইঞ্জীল ১৮ তারিখে নযিল হয়েছে।- (ইবনে-কাসীর)

উল্লেখিত হাদীসে পূর্ববর্তী কিতাবসমূহের অবতরণ সম্পর্কিত যেসব তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেসব তারিখে সেসব কিতাব গোটাই নাযিল করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কোরআনের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তা সম্পূর্ণভাবে রমযানের কোন এক রাতে লওহে মাহ্ফূয থেকে পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ করে দেয়া হলেও হুযূর আকরাম (সাঃ)-এর উপর বীরে ধীরে তেইশ বছরে তা অতীর্ণ হয়।

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ – এই একটি মাত্র বাক্যে রোযা সম্পর্কিত বহু হুকুম-আহকাম ও মাসআলা-মাসায়েলের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। شهد শব্দটি شهود থেকে গঠিত। এর অর্থ উপস্থিতি ও বর্তমান থাকা। আরবী অভিধানে الشهر অর্থ মাস। এখানে অর্থ হল রমযান মাস। কাজেই বাক্যটির অর্থ দাঁড়াল এই যে, 'তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি রমযান মাসে উপস্থিত থাকবে, অর্থাৎ, বর্তমান থাকবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা রাখা কর্তব্য। ইতিপূর্বে রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার যে সাধারণ অনুমতি ছিল এ বাক্যের দ্বারা তা মনসূখ বা রহিত করে দিয়ে রোযা রাখাকেই ওয়াজিব বা অপরিহার্য কর্তব্য করে দেয়া হয়েছে।

রমযান মাসে উপস্থিত বা বর্তমান থাকার মর্ম হল রমযান মাসটিকে এমন অবস্থায় পায়ায়, যাতে রোযা রাখার সামর্থ্য থাকে। অর্থাৎ, মুসলমান, বুদ্ধিমান, সাবালক, মুকীম এবং হায়েয-নেফাস থেকে পবিত্র অবস্থায় রমযান মাসে বর্তমান থাকা।

মাসআলা ঃ এ আয়াতের দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার জন্য রোযার যোগ্য অবস্থায় রমযান মাসের উপস্থিতি একটি শর্ত। এমতাবস্থায় যে লোক পূর্ণ রমযান মাসকে পাবে, তার উপর গোটা রমযান মাসের রোযা ফরয হয়ে যাবে। যে লোক এ অবস্থায় কিছু কম সময় পাবে, তার উপর ততদিনই ফরয হবে। কাজেই রমযান মাসের মাঝে যদি কোন কাফের ব্যক্তি মুসলমান হয়, কিংবা কোন নাবালেগ যদি বালেগ হয়, তবে তার উপর পরবর্তী রোযাগুলোই ফরয হবে; বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা করার প্রয়োজন হবে না। অবশ্য উন্মাদ ব্যক্তি মুসলমান ও বালেগ হওয়ার প্রেক্ষিতে যেহেতু ব্যক্তিগত যোগ্যতার অধিকারী হয়, সেহেতু সে যদি রমযানের কোন অংশে সুস্থ হয়ে উঠে, তবে এ রমযানের বিগত দিনগুলোর কাযা করাও তার উপর অবশ্য কর্তব্য হয়ে পড়বে। তেমনিভাবে হায়েয- নেফাসগ্রস্ত স্ত্রীলোক যদি রমযানের মাঝে পাক হয়ে যায় অথবা কোন অসুস্থ লোক যদি সুস্থ হয়ে উঠে কিংবা কোন মুসাফির যদি মুকীম হয়ে যায়, তবে বিগত দিনগুলোর রোযা কাযা

করা তার পক্ষে জরুরী হবে।

মাসআলা ঃ যেসব দেশে রাত ও দিন কয়েক মাস দীর্ঘ হয়ে থাকে সেসব দেশে বাহ্যতঃ মাসের উপস্থিতি প্রত্যক্ষ করা যায় না। অর্থাৎ, রমযান মাসের প্রকাশ্য আগমন ঘটে না। কাজেই সেদেশের অধিবাসীদের উপর রোযা ফরয না হওয়াই উচিত। হানাফী মাযহাব অবলম্বী ফেকাহ্ বিদগণের মধ্যে হালওয়ানী, কেবালী প্রমুখ নামাযের ব্যাপারেও এমনি ফতোয়া দিয়েছেন যে, তাদের উপর নিজেদের দিন-রাত অনুযায়ী নামাযের হুকুম বর্তাবে। অর্থাৎ, যে দেশে মাগরিবের সাথে সাথেই সুবহে-সাদেক হয়ে যায়, সেদেশে এশার নামায ফরয হয় না।-(শামী)

এর তাকাদা হল এই যে, যে দেশে ছয় মাসের দিন হয় সেখানে শুধু পাঁচ ওয়াক্তের নামায ফরয হবে। রমযান আদৌ আসবে না। হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রঃ)-ও 'এমদাদুল-ফাতাওয়া' গ্রন্থে রোযা সম্পর্কে এ মতই গ্রহণ করেছেম।

وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ – আয়াতে রুগ্ন কিংবা মুসাফিরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে যে, সে তখন রোযা না রেখে রোগ সুস্থ হওয়ার পর অথবা সফর শেষ হওয়ার পর ততদিনের রোযা কাযা করে নিবে, এ হুকুমটি যদিও পূর্ববর্তী আয়াতেও উল্লেখ করা হয়েছিল, কিন্তু এ আয়াতে যেহেতু রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া দেয়ার ঐচ্ছিকতাকে রহিত করে দেয়া হয়েছে, কাজেই সন্দেহ হতে পারে যে, হয় তো রুগ্ন কিংবা মুসাফিরের বেলায়ও হুকুমটি রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং এখানে তার পুনরুল্লেখ করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী আয়াতগুলোতে রমযানের হুকুম-আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। তারপর একটি সুদীর্ঘ আয়াতে রোযা ও এ'তেকাফর বিবরণ দেয়া হয়েছে। এখানে মাঝখানে বর্তমান সংক্ষিপ্ত আয়াতটিকে বান্দাদের অবস্থার প্রতি মহান পরওয়ারদেগারের অনুগ্রহ এবং তাদের প্রার্থনা শ্রবণ ও কবুল করার বিষয় আলোচনা করে নির্দেশ পালনে উৎসাহিত করা হচ্ছে। রুগ্ন, রোযা-সংক্রান্ত এবাদতে অবস্থাবিশেষে অব্যাহতি দান এবং বিভিন্ন সুবিধা সত্ত্বেও কিছু কষ্ট বিদ্যমান রয়েছে। এ কষ্টকে সহজ করার উদ্দেশ্যে আল্লাহ্র বিশেষ অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, আমি আমার বান্দাদের সন্নিকটে রয়েছি, যখনই তারা আমার কাছে কোন বিষয় প্রার্থনা বা দোয়া করে, আমি তাদের সে দোয়া কবুল করে নেই এবং তাদের বাসনা পুরণ করে দেই।

এমতাবস্থায় আমার হুকুম-আহ্কাম মেনে চলা বান্দাদেরও একান্ত কর্তব্য। তাতে কিছুটা কষ্ট হলেও তা' সহ্য করা উচিত। ইমাম ইবনে-কাসীর দোয়ার প্রতি উৎসাহদান সংক্রান্ত এই মধ্যবর্তী বাক্যটির পূর্বাপর বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, এ আয়াতের দ্বারা রোযা রাখার পর দোয়া কবুল হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। সে জন্যই রোযার ইফতারের পর দোয়ার ব্যাপারে বিশেষ তৎপরতা অবলম্বন করা উচিত। নবী (সাঃ) এরশাদ করেছেন –

للصائم عند فطره دعوة مستجابة

অর্থাৎ, রোযার ইফতার করার সময় রোযাদারের দোয়া –কবুল হয়ে থাকে।-(আবু দাউদ)

সে জন্যই হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) ইফতারের সময় নিজের সবাইকে সমবেত করে দোয়া করতেন।

মাসআলা ঃ এ আয়াতে فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ (আমি নিকটেই রয়েছি) বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, ধীরে-সুস্থে ও নীরবে দোয়া করাই উত্তম, উচ্চৈঃস্বরে দোয়া করা পছন্দনীয় নয়। ইমাম ইবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের শানে-নুযুল বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, কোন গ্রামের কিছু অধিবাসী রসূলে-করীম (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিল যে, 'যদি আমাদের পরওয়ারদেগার আমাদের নিকটেই থেকে থাকেন, তবে আমরা আস্তে আস্তে দোয়া করব। আর যদি দূরে থেকে থাকেন তবে উচ্চৈঃস্বরে ডাকব।' এরই প্রেক্ষিতে আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

اُحِلَّ لَكُمْ বাক্যাংশটি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, যে বিষয়টিকে এ আয়াত দ্বারা হালাল করা হয়েছে, তা ইতিপূর্বে হারাম ছিল। বোখারী এবং অন্যান্য হাদীসের কিতাবে সাহাবী হযরত বারা ইবনে আ'যেবের বর্ণনায় উল্লেখিত হয়েছে যে, প্রথম যখন রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছিল, তখন ইফতারের পর থেকে শয্যাগ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা ও স্ত্রী-সহবাসের অনুমতি ছিল। একবার শয্যাগ্রহণ করে ঘুমিয়ে পড়ার সাথে সাথেই এ সবকিছু হারাম হয়ে যেতো। কোন কোন সাহাবী এ ব্যাপারে অসুবিধায় পড়েন। কায়স ইবনে-সারমাহ্ আনসারী নামক জনৈক সাহাবী একবার সমগ্র দিন কঠোর পরিশ্রম করে ইফতারের সময় ঘরে এসে দেখেন, ঘরে খাওয়ার মত কোন কিছুই নেই। স্ত্রী বললেন, একটু অপেক্ষা করুন, আমি কোনখান থেকে কিছু সংগ্রহ করে আনার চেষ্টা করি। স্ত্রী যখন কিছু খাদ্য সংগ্রহ করে ফিরে এলেন ততক্ষণে সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন। ইফতারের পর ঘুমিয়ে পড়ার দরুন খানা-পিনা তাঁর জন্য হারাম হয়ে যায়। ফলে পরদিন তিনি এ অবস্থাতেই রোযা রাখেন। কিন্তু দুপুর বেলায় শরীর দুর্বল হয়ে তিনি বেহুঁশ হয়ে পড়ে যান।-(ইবনে-কাসীর)

অনুরূপভাবে কোন কোন সাহাবী গভীর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গার পর স্ত্রীদের সাথে সহবাসে লিপ্ত হয়ে মানসিক কষ্টে পতিত হন। এসব ঘটনার পর এ আয়াত নাযিল হয়, যাতে পূর্ববর্তী হুকুম রহিত করে সূর্যাস্তের পর থেকে শুরু করে সুবহে – সাদেক উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র রাতেই খানা-পিনা ও স্ত্রী সহবাস বৈধ করা হয়েছে। ঘুমাবার পূর্বে কিংবা ঘুম থেকে উঠার পর সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতাই এতে আর অবশিষ্ট রাখা হয়নি। এমনকি হাদীস অনুযায়ী শেষরাত্রে সেহ্রী খাওয়া সুন্নত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আলোচ্য আয়াতে এ সম্পর্কিত নির্দেশই প্রদান করা হয়েছে।

সেহরী খাওয়ার শেষ সময়সীমা ঃ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْاَبْيَضُ আয়াতে রাতের অন্ধকারকে কালো রেখা এবং ভোরের আলো ফোটাকে সাদা রেখার সাথে তুলনা করে রোযার শুরু এবং খানা-পিনা হারাম হওয়ার সঠিক সময়টি বুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু এ সময়সীমার মধ্যে বেশ-কম হওয়ার সম্ভাবনা যাতে না থাকে সেজন্য حَتّٰى يَتَبَيَّنَ শব্দটিও যোগ করে দেয়া হয়েছে। এতে সুস্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে যে, সন্দেহপ্রবণ লোকদের ন্যায় সুবহে-সাদেক দেখা দেয়ার আগেই খানা-পিনা হারাম মনে করো না অথবা এমন অসাবধানতাও অবলম্বন করো না যে, সুবহে-সাদেকের আলো ফুটে উঠার পরও খানা-পিনা করতে থাকবে। বরং খানা-পিনা এবং রোযার মধ্যে সুবহে-সাদেকের উদয় সঠিকভাবে নির্ণয়ই হচ্ছে সীমারেখা। এ সীমারেখা উদয় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত খানা-পিনা বন্ধ করা জরুরী মনে করা যেমন জায়েয নয়, তেমনি সুবহে-সাদেক উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন হয়ে

যাওয়ার পর খানা-পিনা করাও হারাম এবং রোযা নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণ, তা এক মিনিটের জন্য হলেও। সুবহে-সাদেক উদয় সম্পর্কে একীন হওয়া পর্যন্তই সেহরীর শেষ সময়।

মাসআলা ঃ উপরোক্ত আলোচনাগুলো শুধুমাত্র সেসব লোকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের নিজের চোখে 'সুবহে-সাদেক' দেখে সময় নির্ধারণ করার সুযোগ রয়েছে। যেমন, আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে এবং সময় সম্পর্কেও যদি তাদের সঠিক জ্ঞান থাকে। কিন্তু যাদের তেমন সুযোগ নেই, অর্থাৎ, আকাশ ঠিকমত দেখবার সুযোগ নেই, সুবহে-সাদেকের উদয় সম্পর্কে সঠিক ধারণাও নেই, কিংবা আকাশ যদি মেঘাচ্ছন্ন থাকে, তবে এ ক্ষেত্রে সেসব লোকের পক্ষে অন্যান্য লক্ষণ কিংবা জ্যোতির্বিদ্যার সাহায্য নিয়ে সেহরী-ইফতারের সময় নির্ধারণ করতে হবে। অবশ্য এসব হিসাবের মধ্যেও এমন সময় আসতে পারে, যে সময়সীমার মধ্যে সুবহে-সাদেকের উদয় হওয়ার ব্যাপারে একীন বা স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় না। এমতাবস্থায় সন্দেহযুক্ত সময়ে কি করা উচিত, এ সম্পর্কে ইমাম জাসসাস 'আহকামুল-কোরআন' গ্রন্থে বলেন— এরূপ ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে খানা-পিনা না করাই কর্তব্য। তবে এরূপ সন্দেহপূর্ণ সময়ের মধ্যে অর্থাৎ, সুবহে-সাদেক উদয় হওয়ার পূর্বক্ষণে যদি কেউ প্রয়োজনবশতঃ খানা-পিনা করে ফেলে, তবে সে গোনাহ্গার হবে না। কিন্তু পরে তাহ্কীক বা যাচাই করে যদি দেখা যায়, যে সময় সে খানা-পিনা করেছে সে সময় সুবহে-সাদেক হয়ে গিয়েছিল, তবে তার পক্ষে সেদিনের রোযার কাযা করা ওয়াজিব হবে। যেমন, রমযানের এক তারিখে চাঁদ না দেখার কারণে লোকেরা রোযা রাখল না, কিন্তু পরে জানা গেল যে, ২৯শে শাবানেই রমযানের চাঁদ উদিত হয়েছিল। তবে এমতাবস্থায় যারা সে দিনটিকে ৩০শে শাবান মনে করে রোযা রাখেনি, তারা গোনাহগার হবে না, তবে তাদের এ দিনের রোযা সকল ইমামের মতেই কাযা করতে হবে। অনুরূপভাবে মেঘলা দিনে কেউ সূর্য অস্ত গেছে মনে করে ইফতার করে ফেললো, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই সূর্য দেখা দিল এমতাবস্থায় এ ব্যক্তি গোনাহগার হবে না সত্য, তবে তার উপর ঐ রোযা কাযা করা ওয়াজিব হবে।

ইমাম জাস্সাসের উপরোক্ত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায় যে, কোন ব্যক্তি যদি ঘুম ভাঙ্গার পর শুনতে পায় যে, ফজরের আযান হচ্ছে, তখন তার পক্ষে সুবহে-সাদেক উদয় হওয়া সম্পর্কে নিঃসন্দেহে একীন হয়ে যায়। এরপরও যদি সে জেনে শুনে কিছু খেয়ে নেয়, তবে সে গোনাহ্গারও হবে এবং তার উপর সে রোযা কাযা করাও ওয়াজিব হবে। অপরপক্ষে যদি সে সন্দেহযুক্ত সময়ে খায় এবং পরে সুবহে-সাদেক এ সময়েই উদিত হয়েছিল বলে জানতে পারে, তবে তার উপর থেকে গোনাহ্ রহিত হয়ে যাবে বটে, কিন্তু রোযার কাযা করতে হবে।

এ'তেকাফ ঃ এ'তেকাফ-এর শাব্দিক অর্থ কোন একস্থানে অবস্থান করা। কোরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় কতকগুলো বিশেষ শর্তসাপেক্ষে একটা নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে নির্দিষ্ট মসজিদে অবস্থান করাকে এ'তেকাফ বলা হয়। فِي الْمَسٰجِدِ বাক্যের দ্বারা বোঝা যায় যে, এ'তেকাফ যে কোন মসজিদেই হতে পারে। কেননা, এখানে মসজিদ শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

শুধুমাত্র যেসব মসজিদে নিয়মিত জামাত হয়, সেসব মসজিদেই এ'তেকাফ করা বৈধ। অন্যান্য মসজিদ যেখানে নিয়মিত জামাত হয় না, সেগুলোতে এ'তেকাফ না হওয়ার ব্যাপারে ফেকাহ্বিদগণ যে শর্ত আরোপ করে থাকেন, তা 'মসজিদ' শব্দের সংজ্ঞা থেকেই গ্রহণ করা হয়েছে। কেননা, যেখানে নিয়মিত জামাতে নামায হয়, তাকেই কেবল মসজিদ বলা যেতে পারে। বাসস্থান বা দোকান-পাট সর্বত্রই বিচ্ছিন্নভাবে নামায পড়া জায়েয এবং তা হয়েও থাকে, কিন্তু তাই বলে সেগুলোকে মসজিদ বলা হয় না।

মাসআলা ঃ এ'তেকাফের অবস্থায় খানা-পিনার হুকুম সাধারণ রোযাদারদের প্রতি প্রযোজ্য নির্দেশেরই অনুরূপ। তবে স্ত্রী-সহবাসের ব্যাপারে এ অবস্থায় পৃথক নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে যে, এ'তেকাফ অবস্থায় এটা রাতের বেলায়ও জায়েয নয়। এ আয়াতে সে নির্দেশই ব্যক্ত হয়েছে।

রোযার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করার নির্দেশ ঃ সর্বশেষ আয়াত تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَقْرَبُوْهَا বলে ইশারা করা হয়েছে যে, রোযার মধ্যে খানা-পিনা এবং স্ত্রী-সহবাস সম্পর্কিত যেসব নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, এগুলো আল্লাহ্ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা, এর ধারে- কাছেও যেয়ো না। কেননা, কাছে গেলেই সীমালঙ্ঘনের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। একই কারণে রোযা অবস্থায় কুলি করতে বাড়াবাড়ি করা, যদ্দরুন গলার ভেতরে পানি প্রবেশ করতে পারে; মুখের ভিতর কোন অযুথ ব্যবহার করা, স্ত্রীর অতিরিক্ত নিকটবর্তী হওয়া প্রভৃতি মকরূহ। তেমনিভাবে সময় শেষ হওয়ার সম্ভাবনা এড়ানোর জন্য সময়ের কিছুটা আগেই সেহরী খাওয়া শেষ করে দেয়া এবং ইফতার গ্রহণে দু'চার মিনিট দেরী করা উত্তম। এসব ব্যাপারে অসাবধানতা এবং শৈথিল্য প্রদর্শন আল্লাহ্র এই নির্দেশের পরিপন্থী।

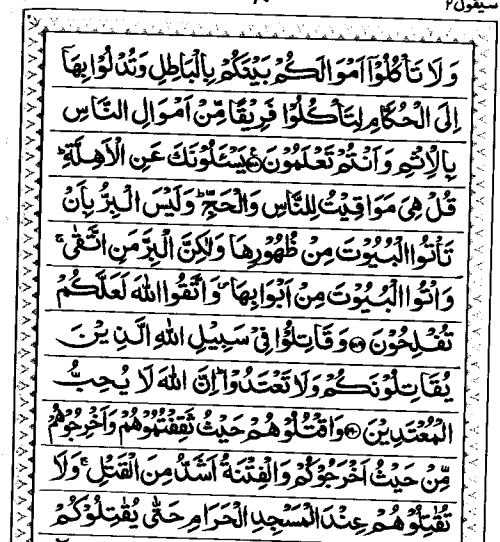

وَلَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ
اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ﴿١٨٨﴾ يَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الْاَهِلَّةِ ۭ
قُلْ هِىَ مَوَاقِيْتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۭ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِاَنْ
تَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ ظُهُوْرِهَا وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقٰى ۚ
وَاْتُوا الْبُيُوْتَ مِنْ اَبْوَابِهَا ۠ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ ﴿١٨٩﴾ وَقَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ
يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوْا ۭ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِيْنَ ﴿١٩٠﴾ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ
مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا
تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ
فِيْهِ ۚ فَاِنْ قٰتَلُوْكُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ ۭ كَذٰلِكَ جَزَاۗءُ
الْكٰفِرِيْنَ ﴿١٩١﴾ فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٩٢﴾
وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ
لِلّٰهِ ۭ فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَي الظّٰلِمِيْنَ ﴿١٩٣﴾

(১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না এবং জনগণের সম্পদের কিয়দংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না। (১৮৯) তোমার নিকট তারা জিজ্ঞেস করে নতুন চাঁদের বিষয়ে। বলে দাও যে, এটি মানুষের জন্য সময় নির্ধারণ এবং হজ্বের সময় ঠিক করার মাধ্যম। আর পেছনের দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করার মধ্যে কোন নেকী বা কল্যাণ নেই। অবশ্য নেকী হল আল্লাহ্‌কে ভয় করার মধ্যে। আর তোমরা ঘরে প্রবেশ কর দরজা দিয়ে এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক যাতে তোমরা নিজেদের বাসনায় কৃতকার্য হতে পার। (১৯০) আর লড়াই কর আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে তাদের সাথে, যারা লড়াই করে তোমাদের সাথে। অবশ্য কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর তাদেরকে হত্যা কর যেখানে পাও সেখানেই এবং তাদেরকে বের করে দাও সেখান থেকে যেখান থেকে তারা বের করেছে তোমাদেরকে। বস্তুতঃ ফেতনা-ফাসাদ বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যার চেয়েও কঠিন অপরাধ। আর তাদের সাথে লড়াই করো না মসজিদুল হারামের নিকটে যতক্ষণ না তারা তোমাদের সাথে সেখানে লড়াই করে। অবশ্য যদি তারা নিজেরাই তোমাদের সাথে লড়াই করে, তাহলে তাদেরকে হত্যা কর। এই হল কাফেরদের শাস্তি। (১৯২) আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ্ অত্যন্ত দয়ালু। (১৯৩) আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর যে পর্যন্ত না ফেতনার অবসান হয় এবং আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায়, তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপার আলাদা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

আলোচ্য আয়াতে হারাম পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নিষিদ্ধতা বর্ণিত হয়েছে। যেমন, ইতিপূর্বে সূরা বাক্বারারই ১৬৮-তম আয়াতে হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জন এবং ভোগ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। পূর্ববর্তী সে আয়াতে বলা হয়েছিল ঃ

"হে মানবমণ্ডলী ! জমিনের মধ্যে যা কিছু রয়েছে, তা থেকে তোমরা হালাল ও পবিত্র বস্তুসমূহ খাও, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।"

অনুরূপ সূরা-নাহলে এরশাদ হয়েছে-

"তোমাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা যে পবিত্র ও হালাল রুযী দান করেছেন, তা থেকে খাও এবং আল্লাহ্‌র নেয়ামতসমূহের শুকরিয়া আদায় কর, যদি তোমরা তাঁরই উপাসক হয়ে থাক।"

প্রথম আয়াতে সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ)-এর একটি প্রশ্ন এবং আল্লাহ্ তাআলার তরফ থেকে তার জওয়াবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। মুফাসসেরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবায়ে-কেরামের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁরা রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর প্রতি সম্ভ্রম ও সমীহ বোধের কারণে খুব কমই প্রশ্ন করতেন। তাঁরা এক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যমানার উম্মতদের ব্যতিক্রম ছিলেন। পূর্ববর্তী উম্মতগণ এ আদবের প্রতি সচেতন ছিল না। তারা সব সময় নানা অবান্তর প্রশ্ন করতো। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, সাহাবীগণের যেসব প্রশ্নের উল্লেখ কোরআন মজীদে বিদ্যমান রয়েছে, তা সংখ্যায় মাত্র চৌদ্দটি। এ চৌদ্দটি প্রশ্নের মধ্যে একটি প্রশ্ন وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ (যখন আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার কাছে প্রশ্ন করে।) দ্বিতীয় প্রশ্নটি আলোচ্য চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত। এই দু'টি প্রশ্ন ছাড়াও সূরা বাক্বারায় আরও ছয়টি প্রশ্নের উল্লেখ রয়েছে। বাকী ছয়টি প্রশ্ন পরবর্তী বিভিন্ন সূরায় বিদ্যমান।

উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, সাহাবায়ে-কেরাম (রাঃ) হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে 'আহিল্লা' বা নতুন চাঁদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। কারণ, চাঁদের আকৃতি-প্রকৃতি সূর্য থেকে ভিন্নতর। সেটা এক সময় সরু বাঁকা রেখার আকৃতি ধারণ করে অতঃপর ক্রমানুয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে; অবশেষে সম্পূর্ণ গোলকের মত হয়ে যায়। এরপর পুনরায় ক্রমানুয়ে হ্রাসপ্রাপ্ত হতে থাকে। এই হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ অথবা এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে তাঁরা প্রশ্ন করেছিলেন। এই দুই প্রকার প্রশ্নেরই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু যে উত্তর প্রদান করা হয়েছে, তাতে এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কেই বর্ণিত হয়েছে। যদি প্রশ্নই এই হয়ে থাকে যে, চাঁদের হ্রাস-বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি? তবে তো প্রশ্ন অনুযায়ী উত্তর হয়েই গেছে। আর যদি প্রশ্নে এই হ্রাস-বৃদ্ধির অন্তর্নিহিত রহস্য জানবার উদ্দেশ্য থেকে থাকে, যা ছিল সাহাবায়ে-কেরামের স্বভাববিরুদ্ধ, তবে চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মৌল- তত্ত্ব বর্ণনার পরিবর্তে তার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বর্ণনার দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আকাশের গ্রহ-উপগ্রহ ও নক্ষত্রমণ্ডলীর মৌলিক উপাদান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা মানুষের ক্ষমতার উর্ধ্বে। আর মানুষের ইহলৌকিক বা পারলৌকিক কোন বিষয়ই এই জ্ঞান লাভের উপর নির্ভরশীল নয়। কাজেই চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধির মূল কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক। এ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য ও জবাব এই যে, চন্দ্রের এরূপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং উদয়াস্তের মধ্যে আমাদের কোন কোন মঙ্গল নিহিত? সেজন্য আল্লাহ্

তাআলা প্রশ্নের উত্তরে রসূলুল্লাহ (সাঃ)–কে ওহীর মাধ্যমে বলে দিয়েছেন যে, আপনি তাদেরকে বলে দিন, চাঁদের সঙ্গে তোমাদের যেসব মঙ্গল ও কল্যাণ সম্পৃক্ত তা এই যে, এতে তোমাদের কাজ–কর্ম ও চুক্তির মেয়াদ নির্ধারণ এবং হজ্বের দিনগুলোর হিসাব জেনে রাখা সহজতর হবে।

শরীয়তের দৃষ্টিতে চান্দ্র ও সৌর–হিসাবের গুরুত্ব ঃ এ আয়াতে এতটুকু বোঝা গেল যে, চন্দ্রের দ্বারা তোমরা তারিখ ও মাসের হিসাব জানতে পারবে, যার উপর তোমাদের লেন দেন আদান –প্রদান এবং হজ্ব প্রভৃতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এ প্রসঙ্গটিই সূরা ইউনুসে বিবৃত হয়েছে ঃ

وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হল যে, বিভিন্ন পর্যায় ও বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে চন্দ্রের পরিক্রমণের উপকারিতা এই যে, এর দ্বারা বর্ষ, মাস ও তারিখের হিসাব জানা যায়, কিন্তু সূরা বনী–ইসরায়ঈলের আয়াতে বর্ষ, মাস ও দিন–ক্ষণের হিসাব যে সূর্যের সঙ্গেও সম্পর্কযুক্ত তাও বিবৃত হয়েছে। বলা হয়েছে ঃ

فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا
فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ

অর্থাৎ, ''অতঃপর আমি রাতের চিহ্ন তিরোহিত করে দিনের চিহ্নকে দর্শনযোগ্য করলাম, যাতে তোমরা আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের দান রুযী–রোযগারের অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তোমরা বর্ষপঞ্জী ও দিন–ক্ষণের হিসাব অবগত হতে পার।''–(বনী–ইসরায়ঈল)

এই তৃতীয় আয়াত দ্বারা যদিও প্রমাণিত হলো যে, বর্ষ, মাস ইত্যাদির হিসাব সূর্যের আহ্নিক গতি এবং বার্ষিক গতি দ্বারাও নির্ণয় করা যায়। কিন্তু চন্দ্রের ক্ষেত্রে কোরআন যে ভাষা প্রয়োগ করেছে, তাতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামী শরীয়তে চান্দ্রমাসের হিসাবই নির্ধারিত। রমযানের রোযা, হজ্বের মাস ও দিনসমূহ, মহররম, ঈদ, শবে–বরাত ইত্যাদির সঙ্গে যেসব বিধি–নিষেধ সম্পৃক্ত, সেগুলো সবই 'রুইয়াতে–হেলাল' বা নতুন চাঁদ দেখার উপর নির্ভরশীল। কেননা, এই আয়াতে هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ – 'এটি মানুষের হজ্ব ও সময় নির্ধারণের উপায়' বলে জানিয়ে দেয়া হয়েছে, যদিও এই হিসাব সূর্যের দ্বারাও অবগত হওয়া যায়, তবুও আল্লাহর নিকট চন্দ্রমাসের হিসাবই নির্ভরযোগ্য।

ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক চান্দ্রমাসের হিসাব গ্রহণ করার কারণ এই যে, প্রত্যেক দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিই আকাশে চাঁদ দেখে চান্দ্রমাসের হিসাব অবগত হতে পারে। পণ্ডিত, মূর্খ, গ্রামবাসী, মরুবাসী, পার্বত্য উপজাতি ও সভ্য–অসভ্য নির্বিশেষে সবার জন্যই চান্দ্রমাসের হিসাব সহজতর। কিন্তু সৌরমাস ও সৌরবৎসর এর সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। এর হিসাব জ্যোতির্বিদদের ব্যবহার্য দূরবীক্ষণ যন্ত্রসহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি এবং ভৌগোলিক, জ্যামিতিক ও জ্যোতির্বিদ্যার সূত্র ও নিয়ম–কানুনের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। এই হিসাব প্রত্যেকের পক্ষে সহজে অবগত হওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া এবাদত–বন্দেগীর ক্ষেত্রে চান্দ্রমাসের হিসাব বাধ্যতামূলক করা হলেও সাধারণ ব্যবসা–বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ হিসাবেরই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। চাঁদ ইসলামী এবাদতের অবলম্বন। চাঁদ এক হিসেবে ইসলামের প্রতীক বা শে'আরে ইসলাম। ইসলাম যদিও সৌরপঞ্জী ও সৌর–হিসাবকে এই শর্তে নাজায়েয বলেনি, তবুও এতটুকু সাবধান অবশ্যই করেছে, যেন সৌর হিসাব এত প্রাধান্য লাভ না করে, যাতে লোকেরা চান্দ্রপঞ্জী ও চান্দ্রমাসের হিসাব ভুলেই যায়। কারণ, এরূপ করাতে রোযা, হজ্ব ইত্যাদি এবাদতে ত্রুটি হওয়া অবশ্যম্ভাবী।

মাসআলা ঃ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا ('ঘরের পিছন দিক দিয়ে প্রবেশ করাতে তোমাদের জন্য কোন পুণ্য নেই') এই আয়াত দ্বারা এই মাসআলা জানা গেল যে, যে বিষয়কে ইসলামী শরীয়ত প্রয়োজনীয় বা এবাদত বলে মনে করে না, তাকে নিজের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় বা এবাদত মনে করা জায়েয নয়। এমনিভাবে যে বিষয় শরীয়তে জায়েয রয়েছে, তাকে পাপ মনে করাও গোনাহ্। মক্কার কাফেররা তাই করছিল। তারা ঘরের দরজা দিয়ে প্রবেশ করা শরীয়তসম্মতভাবে জায়েয থাকা সত্ত্বেও না–জায়েয মনে করতো এবং পাপ বলে গণ্য করতো, ঘরের পিছন দিক দিয়ে দেয়াল ভেঙ্গে বা বেড়া কেটে বা সিঁধ কেটে ঘরে প্রবেশ করাকে (শরীয়তে যার কোন আবশ্যকতাই ছিল না) নিজেদের জন্য অপরিহার্য ও অত্যাবশ্যকীয় বলে মনে করেছিল। এ ব্যাপারে তাদের সতর্ক করে দেয়া হয়েছে।

'বেদআত'–এর না–জায়েয হওয়ার বড় কারণই তাই যে, এতে অপ্রয়োজনীয় বিষয়সমূহকে ফরয– ওয়াজিবের মতই অত্যাবশ্যকীয় মনে করা হয় অথবা কোন কোন জায়েয বস্তুকে না–জায়েয ও হারাম বলে গণ্য করা হয়। আলোচ্য আয়াতে এরূপ শরীয়ত–বহির্ভূত নিয়মে জায়েযকে না–জায়েয মনে করা অথবা হারামকে হালাল মনে করা বা 'বেদআত'–এর প্রচলন করার নিষেধাজ্ঞা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

জেহাদ বা ন্যায়ের সংগ্রাম ঃ গোটা মুসলিম উম্মাহ এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জেহাদ' ও কেতাল' তথা যুদ্ধ–বিগ্রহ নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কোরআন মজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়–অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী' ইবনে–আনাস (রাঃ)–এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়।

এই আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সে সব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ–সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসারত্যাগী, উপাসনারত সন্ন্যাসী–পাদরী প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরী করে, কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক হয় না —সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েয নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদেরই সঙ্গে যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে, যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্মপ্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকারে যুদ্ধে তাদেরকে সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা

জায়েয। কারণ, তারা الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' এই আয়াতের আওতাভুক্ত। (মাযহারী, কুরতুবী ও জাস্‌সাস) যুদ্ধের সময় রসূলুল্লাহ (সাঃ)–এর তরফ থেকে মুজাহিদদেরকে যেসব উপদেশ দেয়া হতো, সেগুলোর মধ্যে এ নির্দেশের বিস্তারিত উল্লেখ রয়েছে।

আয়াতের শেষাংশে وَلَا تَعْتَدُوْا (এবং সীমা অতিক্রম করো না)–বাক্যটির অর্থ অধিকাংশ তফসীরকারের মতে এই যে, নারী ও শিশুদেরকে হত্যা করে সীমা অতিক্রম করো না।

وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوْهُمْ وَاَخْرِجُوْهُمْ مِّنْ حَيْثُ اَخْرَجُوْكُمْ

– (আর তাদেরকে যেখানে পাও সেখানেই হত্যা কর এবং যেখান থেকে তারা তোমাদেকে বের করে দিয়েছে, তোমরাও তাদেরকে সেখান থেকে বের করে দাও।) হুদায়বিয়ার সন্ধি–চুক্তির শর্ত মোতাবেক হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ) সাহাবায়ে–কেরাম (রাঃ)–সহ সে ওমরার কাযা আদায়ের উদ্দেশে যাত্রার নিয়ত করেন, আগের বছর মক্কার কাফেররা যে ওমরা আদায়ে বাধা প্রদান করেছিল। কিন্তু সাহাবায়ে–কেরামের মনে তখন সন্দেহের উদ্রেক হয় যে, কাফেররা হয় তো তাদের সন্ধি ও চুক্তির মর্যাদা রক্ষা করবে না। যদি তারা এ বছরও তাঁদেরকে বাধা দেয়, তবে তাঁরা কি করবেন? এ প্রসঙ্গেই উল্লেখিত আয়াতে অনুমতি প্রদান করা হলো যে, যদি তারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তোমাদেরও তার সমুচিত জবাব দেয়ার অনুমতি থাকলো।

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবিগণের ধারণা হয়েছিল যে, হয় তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফেরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দোষণীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদনকল্পে এরশাদ হলো ঃ وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ –(এবং ফেতনা বা দাঙ্গা–হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ)। অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজনবিদিত যে, নরহত্যা নিকৃষ্ট কর্ম, কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদিগকে ওমরা ও হজ্বের মত এবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فتنة (ফেতনাহ) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের এবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বোঝানো হয়েছে।– (জাস্‌সাস, কুরতুবী প্রমুখ)

অবশ্য এ আয়াতের ব্যাপকতার দ্বারা বোঝা যায় যে, কাফেররা যেখানেই থাকুক না কেন, তাদেরকে হত্যা করা শরীয়তসিদ্ধ। আয়াতের এই ব্যাপকতাকে পরবর্তী বাক্যে এই বলে সীমিত করা হয়েছে–

وَلَا تُقٰتِلُوْهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقٰتِلُوْكُمْ فِيْهِ

অর্থাৎ, 'মসজিদুল–হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকা তথা পুরো হরমে মক্কায় তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করো না, যতক্ষণ না তারা নিজেরাই তোমাদের উপর আক্রমণোদ্যত হয়।

মাসআলা ঃ হরমে–মক্কার বা মক্কার সম্মানিত এলাকায় মানুষ তো দূরের কথা, কোন হিংস্র পশু হত্যা করাও জায়েয নয়। কিন্তু এই আয়াত দ্বারা জানা গেল যে, যদি কেউ অপরকে হত্যায় প্রবৃত্ত হয়, তাখন তার প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা জায়েয। এই মর্মে সমস্ত ফেকাহ্‌বিদগণ একমত।

মাসআলা ঃ এ আয়াত দ্বারা আরও বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথম অভিযান আক্রমণ বা আগ্রাসন কেবলমাত্র মসজিদুল–হারামের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বা 'হরমে মক্কায়'–ই নিষিদ্ধ। অপরাপর এলাকায় যেমন প্রতিরোধমূলক যুদ্ধ অপরিহার্য, তেমনি প্রথম আক্রমণ বা অভিযানও জায়েয।

সপ্তম হিজরী সনে যখন রসূলুল্লাহ (সাঃ) হুদায়বিয়ার সন্ধি–চুক্তির শর্ত অনুযায়ী বিগত বছরের ওমরার কাযা আদায় করার নিয়তে সাহাবিগণ (রাঃ)–সহ মক্কা অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন হযরত (সাঃ)–এর সাহাবিগণ জানতেন যে, কাফেরদের কাছে চুক্তি ও সন্ধির কোনই মর্যাদা নেই। এমনও হতে পারে, তারা সন্ধির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে। তখন সে ক্ষেত্রে সাহাবিগণের মনে এই আশঙ্কার উদ্ভব হয় যে, এতে করে হরম–শরীফেও যুদ্ধ সংঘটিত হয়ে যেতে পারে, যা ইসলামী শরীয়তে নিষিদ্ধ। উপরের আয়াতে সাহাবিগণের এ আশঙ্কার জবাব দান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ঃ মক্কার হরম–শরীফের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুসলমানদের অবশ্যই অপরিহার্য কর্তব্য। কিন্তু যদি কাফেররা হরম–শরীফের এলাকায় মুসলমানদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার মোকাবেলায় মুসলমানদের পক্ষেও যুদ্ধ করা জায়েয।

সাহাবিগণের মনে দ্বিতীয় সন্দেহ এই ছিল যে, এটা যিলকদ মাস এবং সে চার মাসেরই অন্তর্ভুক্ত, যেগুলোকে 'আশহুরে–হারাম' বা সম্মানিত মাস বলা হয়। এই মাসসমূহে কোথাও কারও সংগে যুদ্ধ করা জায়েয নয়। এমতাবস্থায় যদি মক্কার মুশরিকরা আমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে, তবে আমরা এই মাসে তার প্রতিরোধকল্পে কিভাবে যুদ্ধ করবো! তাঁদের এই দ্বিধা দূর করার জন্যই আয়াতটি নাযিল করা হয়েছে। অর্থাৎ, মক্কার হরম–শরীফের সম্মানার্থ শত্রুর হামলা প্রতিরোধকল্পে যুদ্ধ করা যেমন শরীয়তসিদ্ধ, তেমনিভাবে হারাম মাসের (সম্মানিত মাসেও) যদি কাফেররা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, তবে তার প্রতিরোধকল্পে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাও জায়েয।

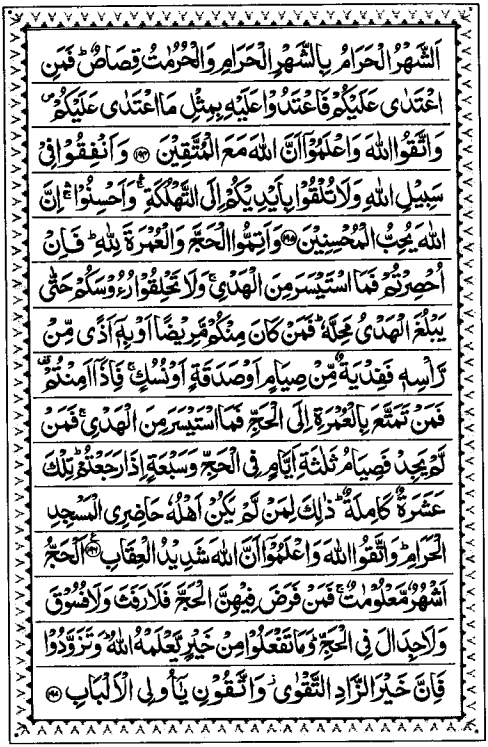

اَلشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمٰتُ قِصَاصٌ ؕ فَمَنِ
اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدٰى عَلَيْكُمْ ۪
وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ ﴿١٩٤﴾ وَاَنْفِقُوْا فِيْ
سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ ۛ وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ
اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿١٩٥﴾ وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ ؕ فَاِنْ
اُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ وَلَا تَحْلِقُوْا رُءُوْسَكُمْ حَتّٰى
يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهٗ ؕ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيْضًا اَوْ بِهٖٓ اَذًى مِّنْ
رَّاْسِهٖ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ ۚ فَاِذَآ اَمِنْتُمْ ۪
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ اِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ۚ فَمَنْ
لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلٰثَةِ اَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ اِذَا رَجَعْتُمْ ؕ تِلْكَ
عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ؕ ذٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿١٩٦﴾ اَلْحَجُّ
اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ ۚ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ
وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ؕ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ ؕ وَتَزَوَّدُوْا
فَاِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى ۫ وَاتَّقُوْنِ يٰٓاُولِي الْاَلْبَابِ ﴿١٩٧﴾

(১৯৪) সম্মানিত মাসই সম্মানিত মাসের বদলা। আর সম্মান রক্ষা করারও বদলা রয়েছে। বস্তুতঃ যারা তোমাদের উপর জবরদস্তি করেছে, তোমরা তাদের উপর জবরদস্তি কর, যেমন জবরদস্তি তারা করেছে তোমাদের উপর। আর তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং জেনে রাখ, যারা পরহেযগার, আল্লাহ্ তাদের সাথে রয়েছেন। (১৯৫) আর ব্যয় কর আল্লাহ পথে, তবে নিজের জীবনকে ধ্বংসের সম্মুখীন করো না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন। (১৯৬) আর তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশে হজ্জ ও ওমরাহ্ পরিপূর্ণভাবে পালন কর। যদি তোমরা বাধাপ্রাপ্ত হও, তাহলে কোরবানীর জন্য যাকিছু সহজলভ্য, তাই তোমাদের উপর ধার্য। আর তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত মাথা মুণ্ডন করবে না, যতক্ষণ না কোরবানী যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। যারা তোমাদের মধ্যে অসুস্থ হয়ে পড়বে কিংবা মাথায় যদি কোন কষ্ট থাকে, তাহলে তার পরিবর্তে রোযা করবে কিংবা খয়রাত দেবে অথবা কুরবানী করবে। আর তোমাদের মধ্যে যারা হজ্জ ও ওমরাহ্ একত্রে একই সাথে পালন করতে চাও, তবে যাকিছু সহজলভ্য, তা দিয়ে কুরবানী করাই তার উপর কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা কোরবানীর পশু পাবে না, তারা হজ্জের দিনগুলোর মধ্যে রোযা রাখবে তিনটি আর সাতটি রোযা রাখবে ফিরে যাবার পর। এভাবে দশটি রোযা পূর্ণ হয়ে যাবে। এ নির্দেশটি তাদের জন্য, যাদের পরিবার-পরিজন মসজিদুল-হারামের আশে-পাশে বসবাস করে না। আর আল্লাহ্‌কে ভয় করতে থাক। সন্দেহাতীতভাবে জেনো যে, আল্লাহ্‌র আযাব বড়ই কঠিন। (১৯৭) হজ্জের কয়েকটি মাস আছে সুবিদিত। এসব মাসে যে লোক হজ্জের পরিপূর্ণ নিয়ত করবে, তার পক্ষে স্ত্রীও সাথে নিরাভরণ হওয়া জায়েজ নয়। না আশোভন কোন কাজ করা, না ঝাপড়া-বিবাদ করা হজ্জের সেই সময় জায়েজ নয়। আর তোমরা যাকিছু সৎকাজ কর, আল্লাহ্ তা জানেন। আর তোমরা পাথেয় সাথে নিয়ে নাও। নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম পাথেয় হচ্ছে আল্লাহ্‌র ভয়। আর আমাকে ভয় করতে থাক, হে বুদ্ধিমানগণ! তোমাদের উপর তোমাদের পালনকর্তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করায় কোন পাপ নেই।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য

জেহাদে অর্থ ব্যয় ঃ وَاَنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (এবং তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর)- এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজনমত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফেকাহ্‌শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও ব্যয় খাত রয়েছে, যেগুলো ফরয। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্যে কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন তখন ততটুকুই খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই ফরয নয়। জেহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ -(এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিও না।) আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বোঝানো হয়েয়ে? এ প্রসঙ্গে কোরআন মজীদের ব্যাখ্যাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার। ইমাম জাস্‌সাস ও ইমাম রাযী (রাহঃ) বলেছেন, আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তমরূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ্ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখা-শোনা করি। এ প্রসঙ্গেই এই আয়াতটি নাযিল হলো। এতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, 'ধ্বংসে'র দ্বারা এখানে জেহাদ পরিত্যাগ করাকেই বোঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে, জেহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসেরই কারণ। সেজন্যই হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রাঃ) সারা জীবনই জেহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ), হুযায়ফা (রাঃ), কাতাদা (রাঃ) এবং মুজাহিদ ও যাহ্‌হাক (রঃ) প্রমুখ তফসীর শাস্ত্রের ইমামগণের কাছ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা' ইবনে আ'যেব (রাঃ) বলেছেন — পাপের কারণে আল্লাহ্‌র রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর। এজন্যই মাগফেরাত সম্পর্কে নিরাশ হওয়া হারাম।

ইমাম জাস্‌সাস্ (রঃ)-এর ভাষ্য অনুযায়ী উপরোক্ত সমস্ত নির্দেশই এ আয়াত থেকে গ্রহণ করা যেতে পারে।

وَاَحْسِنُوْا ۛ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ - এই বাক্যে প্রত্যেক কাজ সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য উৎসাহ দান করা হয়েছে। সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে কাজ করাকে কোরআন 'ইহসান' احسان শব্দের দ্বারা প্রকাশ করেছে। ইহ্‌সান দু'রকম ঃ (১) এবাদতে ইহ্‌সান ও (২) দৈনন্দিন কাজ কর্ম, পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ইহ্‌সান। এবাদতের ইহ্‌সান সম্পর্কে স্বয়ং রসূলুল্লাহ (সাঃ) 'হাদীসে-জিবরাঈল'- এ ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে,

এমনভাবে এবাদত কর, যেন তুমি আল্লাহ্‌কে স্বচক্ষে দেখছ। আর যদি সে পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছতে না পার, তবে এ বিশ্বাস রাখা অপরিহার্য যে, স্বয়ং আল্লাহ্ তোমাকে দেখছেন।

এছাড়া দৈনন্দিন কাজকর্ম এবং পারিবারিক ও সামাজিক ব্যাপারে (মু'আমালাত ও মু'আশারাতে) ইহ্‌সানের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হযরত মা'আয ইবনে জাবাল বর্ণিত মুসনাদে আহমদের এক হাদীসে হযরত রসূলে-করীম (সাঃ) বলেছেন ঃ 'তোমরা নিজেদের জন্যে যাকিছু পছন্দ কর, অন্যান্য লোকদের জন্যেও তাই পছন্দ কর। আর যা তোমরা নিজেদের জন্যে না-পছন্দ কর, অন্যের জন্যেও তা না-পছন্দ করবে।'-(মাযহারী)

হজ্ব সর্বসম্মতভাবে ইসলামের আরকানসমূহের মধ্যে একটি রুক্‌ন এবং ইসলামের ফরায়েয বা অবশ্য করণীয় বিষয়সমূহের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। কোরআনের বহু আয়াত এবং অসংখ্য হাদীসের মাধ্যমে এর প্রতি তাকীদ ও গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

অধিকাংশ ওলামায়ে-কেরামের মতে হিজরী তৃতীয় বছর, যে বছর গুহুদের যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল, সে বছরই সূরা আলে ইমরানের একটি আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে।- (ইবনে কাসীর)

এ আয়াতেই হজ্ব ফরয হওয়ার শর্তসমূহ এবং মর্মার্থ ও ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্ব না করার কঠিন পরিণতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

আলোচ্য আটটি আয়াতের প্রথম আয়াত وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ফুকাহ্‌সেরীনের ঐকমত্য অনুযায়ী হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হয়েছে যা ৬ষ্ঠ হিজরী সালে সংঘটিত হয়েছে। এতে বোঝা যাচ্ছে যে, এ আয়াতের উদ্দেশ্য হজ্ব ফরয হওয়ার বিষয় বাতলানো নয়, তা পূর্বেই বাতলে দেয়া হয়েছে, বরং এখানে উদ্দেশ্য হল হজ্ব ও ওমরার কিছু বিশেষ নির্দেশ বর্ণনা করা।

ওমরার আহ্‌কাম ঃ সূরা আলে-ইমরানের যে আয়াতের মাধ্যমে হজ্ব ফরয করা হয়েছে তাতে যেহেতু শুধুমাত্র হজ্বের কথাই বলা হয়েছে, ওমরার কোন আলোচনাই করা হয়নি, আর এই আয়াতে যাতে শুধু ওমরার কথাই আলোচনা করা হয়েছে, এর ফরয কিংবা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে কোন কথাই বলা হয়নি বরং বলা হয়েছে যে, কোন লোক যদি এহ্‌রামের মাধ্যমে হজ্ব অথবা ওমরা আরম্ভ করে, তাহলে তার পক্ষে তা সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে যায়। যেমন, সাধারণ নফল নামায-রোযার ব্যাপারে এই হুকুম যে, তা আরম্ভ করলে সম্পাদন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। কাজেই এই আয়াতের দ্বারা ওমরা ওয়াজিব কিনা তা বুঝায় না। বরং আরম্ভ করলে শেষ করতে হবে, তাই বুঝায়।

ইবনে-কাসীর হযরত জাবেরের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন ঃ তিনি রসূল (সাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে, হুযুর! ওমরা কি ওয়াজিব? তিনি বলেছিলেন ঃ ওয়াজিব নয়, তবে যদি কর, খুবই ভাল। তিরমিযী বলেছেন, এই হাদীসটি সহীহ ও হাসান। সুতরাং ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মালেক প্রমুখ ওমরাকে ওয়াজিব বলেননি, সুন্নত বলে গণ্য করেছেন। আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, হজ্ব অথবা ওমরা শুরু করলে তা আদায় করা ওয়াজিব। তবে প্রশ্ন উঠে, যদি কোন ব্যক্তি ওমরা শুরু করার পর কোন অসুবিধায় পড়ে তা আদায় করতে না পারে, তাহলে কি হবে? এর উত্তর পরবর্তী فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ - বাক্যে দেওয়া হয়েছে।

এ আয়াতটি হোদায়বিয়ার ঘটনা প্রসংগে অবতীর্ণ হয়েছে। তখন রসূল (সাঃ) এবং সাহাবিগণ এহ্‌রাম অবস্থায় ছিলেন, কিন্তু মক্কার কাফেররা তাঁদেরকে হরমের সীমায় প্রবেশ করতে দেয়নি। ফলে তাঁরা ওমরা আদায় করতে পারেননি। তখন আদেশ হলো, এহ্‌রামের ফিদইয়াস্বরূপ একটি করে কুরবানী কর। কুরবানী করে এহ্‌রাম ভেংগে ফেল। কিন্তু সাথে সাথে পরবর্তী আয়াত وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ - এ বলে দেয়া হয়েছে যে, এহ্‌রাম খোলার শরীয়তসম্মত ব্যবস্থা মাথা মুড়ানো ততক্ষণ পর্যন্ত জায়েয নয়, যতক্ষণ না এহ্‌রামকারীর কুরবানী নির্ধারিত স্থানে পৌঁছবে।

ইমাম আবু হানীফা (রঃ)-এর মতে নির্ধারিত স্থানের সীমানা হচ্ছে হরমের এলাকায় পৌঁছে কুরবানীর পশু যবেহ করা। তা নিজে না পারলে, অন্যের দ্বারা জবাই করাতে হবে। এ আয়াতে অপারকতা অর্থ হচ্ছে, রাস্তায় কোন শত্রু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্ত হওয়া বা প্রাণনাশের আশঙ্কা থাকা। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা ও অন্যান্য কোন কোন ইমাম অসুস্থতাকেও অপারকতার আওতাভুক্ত করেছেন। তবে রসূল (সাঃ)-এর আমল দ্বারাও প্রমাণিত হয়েছে যে, কুরবানী করেই এহ্‌রাম ছাড়তে হবে। কিন্তু বাতিলকৃত হজ্ব বা ওমরা কাযা করা ওয়াজিব। যেমন, হুযূর (সাঃ) এবং সাহাবায়ে-কেরাম হোদায়বিয়া সন্ধির পরবর্তী বছর উল্লেখিত ওমরার কাযা আদায় করেছিলেন।

এ আয়াতে মাথা মুণ্ডনকে এহ্‌রাম ভঙ্গ করার নিদর্শন বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। এতেই প্রমাণিত হয় যে, এহ্‌রাম অবস্থায় মাথা মুণ্ডন বা চুল ছাঁটা অথবা কাটা নিষিদ্ধ। এ হিসাবে পরবর্তী নির্দেশে বলা হয়েছে যে, কেউ যদি হজ্ব ও ওমরা আদায় করতে গিয়ে কোন অসুবিধার সম্মুখীন নাও হয়, কিন্তু অন্য কোন অসুবিধার দরুন মাথা মুণ্ডন করতে বা মাথার চুল কাটাতে বাধ্য হয়, তবে তাকে কি করতে হবে?

এহ্‌রাম অবস্থায় কোন কারণে মাথা মুণ্ডন করলে কি করতে হবে? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ — এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি কোন অসুস্থতার দরুন মাথা বা শরীরের অন্য কোন স্থানের চুল কাটতে হয়, অথবা মাথায় উকুন হওয়াতে বিশেষ কষ্ট পায়, তবে এমতাবস্থায় মাথার চুল বা শরীরের অন্য কোন স্থানের লোম কাটা জায়েয। কিন্তু এর ফিদইয়া বা ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর তা হচ্ছে রোযা রাখা বা সদকা দেয়া বা কুরবানী করা। কুরবানীর জন্যে হরমের সীমারেখা নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু রোযা রাখা বা সদকা দেয়ার জন্যে কোন বিশেষ স্থান নির্ধারিত নেই। তা যে কোন স্থানে আদায় করা চলে। কোরআনের শব্দের মধ্যে রোযার কোন সংখ্যা নির্ধারিত নেই এবং সদকারও কোন পরিমাণ নির্দেশ করা হয়নি। কিন্তু রসূলে করীম (সাঃ) সাহাবী কা'ব ইবনে ওজরার এমনি অবস্থার প্রেক্ষিতে এরশাদ করেছেন, — তিনটি রোযা এবং ছয় জন মিসকীনকে মাথাপিছু অর্ধসা'গম দিতে হবে।— (বোখারী)

হজ্ব মৌসুমে হজ্ব ওমরা একত্রে আদায় করার নিয়ম ঃ ইসলাম পূর্ব যুগে আরববাসীদের ধারণা ছিল, হজ্বের মাস আরম্ভ হয়ে গেলে অর্থাৎ, শাওয়াল মাস এসে গেলে হজ্ব ও ওমরা একত্রে আদায় করা অত্যন্ত পাপ।

এ আয়াতে তাদের এ ধারণার নিরসন করে বলা হয়েছে যে, মীকাতের অভ্যন্তরে বসবাসকারীদের জন্যে এ সময়ের মধ্যে হজ্ব ও ওমরা একত্রে সমাধা করা নিষেধ। কারণ, তাদের পক্ষে হজ্বের মাস অতিক্রান্ত হওয়ার

পরও ওমরার জন্যে দ্বিতীয়বার মীকাতে গমন করা তেমন অসুবিধার ব্যাপার নয়। কিন্তু এ সীমারেখার বাইরে থেকে যারা হজ্ব করতে আসে, তাদের জন্যে দু'টিকেই একত্রে আদায় করা জায়েয করে দেয়া হয়েছে। কেননা, এত দূর-দূরান্ত থেকে ওমরার জন্যে পৃথকভাবে ভ্রমণ করা খুবই কঠিন ও অসুবিধাজনক। সে সমস্ত নির্ধারিত স্থানসমূহকে মীকাত বলা হয়, যা সারা বিশ্বের হজ্বযাত্রিগণ যিনি যে দিক থেকে আগমন করেন, সেসব রাস্তার প্রত্যেকটিতে একটি স্থান আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ থেকে নির্ধারিত করে দেয়া হয়েছে। যখনই মক্কায় আগমনকারীরা এ স্থানে আসবে, তখন হজ্ব অথবা ওমরার নিয়তে এহ্রাম করা আবশ্যক। এহ্রাম ব্যতীত নির্ধারিত এ স্থান অতিক্রম করা গোনাহর কাজ। যেমন, বলা হয়েছে لَمْ يَكُنْ اَهْلُهٗ حَاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ –এর অর্থ তাই। অর্থাৎ, যাদের পরিবার-পরিজন মীকাতের সীমারেখার অভ্যন্তরে বসবাস করে না, তাদের জন্যে হজ্ব ও ওমরা হজ্বের মাসে একত্রে করা জায়েয।

অবশ্য যারা হজ্বের মৌসুমে হজ্ব ও ওমরাকে একত্রে আদায় করে, তাদের উপর এ দু'টি এবাদতের শুকরিয়া আদায় করা ওয়াজিব। তা হচ্ছে, কুরবানী করার সামর্থ্য যাদের রয়েছে তারা বকরী, গাভী, উট প্রভৃতি যা তাদের জন্য সহজলভ্য হয় তা থেকে কোন একটি পশু কুরবানী করবে। কিন্তু যাদের কুরবানী করার মত আর্থিক সংগতি নেই তারা দশটি রোযা রাখবে। হজ্বের ৯ তারিখ পর্যন্ত তিনটি আর হজ্ব সমাপনের পর সাতটি রোযা রাখতে হবে। এ সাতটি রোযা যেখানে এবং যখন সুবিধা, তখনই আদায় করতে পারে। হজ্বের মধ্যে যে ব্যক্তি তিনটি রোযা পালন করতে না পারে, ইমাম আবু-হানীফা এবং কিছুসংখ্যক বিশিষ্ট সাহাবীর মতে তাদের জন্যে কুরবানী করাই ওয়াজিব। যখন সামর্থ্য হয়, তখন কারো মাধ্যমে হরম শরীফে কুরবানী আদায় করবে।

তামাত্তু ও কেরান ঃ হজ্বের মাসে হজ্বের সাথে ওমরাকে একত্রিতকরণের দু'টি পদ্ধতি রয়েছে। একটি হচ্ছে, মীকাত হতে হজ্ব ও ওমরাহর জন্যে একত্রে এহ্রাম করা। শরীয়তের পরিভাষায় একে 'হজ্বে-কেরান' বলা হয়। এর এহ্রাম হজ্বের এহ্রামের সাথেই ছাড়তে হয়, হজ্বের শেষদিন পর্যন্ত তাকে এহ্রাম অবস্থায়ই কাটাতে হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে এই যে, মীকাত হতে শুধু ওমরার এহ্রাম করবে। মক্কা আগমনের পর ওমরার কাজ-কর্ম শেষ করে এহ্রাম খুলবে এবং ৮ই যিলহজ্ব তারিখে মিনা যাবার প্রাক্কালে হরম শরীফের মধ্যেই এহ্রাম বেঁধে নেবে। শরীয়তের পরিভাষায় একে বলা হয় 'তামাত্তু' কিন্তু فَمَنْ تَمَتَّعَ এ সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

হজ্ব ও ওমরার আহ্কামের বিরুদ্ধাচরণ এবং তাতে গাফলতি করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ ঃ শেষ আয়াতটিতে প্রথমে তাকওয়া অবলম্বন করার আদেশ দেয়া হয়েছে; যার অর্থ এসব নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ থেকে বিরত ,সতর্ক ও ভীত থাকা বুঝায়। অতঃপর বলা হয়েছে وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি জেনে শোনে আল্লাহ্র নির্দেশাবলীর বিরুদ্ধাচরণ করে, তার জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আজকাল হজ্ব ও ওমরাকারিগণের অধিকাংশই এ সম্পর্কে অসতর্ক। তারা প্রথমতঃ হজ্ব ও ওমরার নিয়মাবলী জানতেই চেষ্টা করে না। আর যদিও বা জেনে নেয়, অনেকেই তা যথাযথভাবে পালন করে না। অনেকেই দায়িত্ব-জ্ঞানহীন মোয়াল্লেম ও সঙ্গীদের পাল্লায় পড়ে অনেক ওয়াজিবও পরিত্যাগ করে। আর সুন্নত ও মুস্তাহাবের তো কথাই নেই। আল্লাহ্ সবাইকে নিজ নিজ আমল যথাযথভাবে পালন করার তওফীক দান করুন।

হজ্বসংক্রান্ত ৮ টি আয়াতের মধ্যে দ্বিতীয় আয়াত ও তার মাসআলাসমূহ ঃ اَلْحَجُّ اَشْهُرٌ مَّعْلُوْمٰتٌ –'আশহুরুন' শব্দটি শাহ্রুন শব্দের বহুবচন। এর অর্থ, মাস। পূর্ববর্তী আয়াতে বলা হয়েছিল, যারা হজ্ব অথবা ওমরা করার নিয়তে এহ্রাম বাঁধে, তাদের উপর এর সকল অনুষ্ঠানক্রিয়াদি সম্পন্ন করা ওয়াজিব হয়ে পড়ে। এ দু'টির মধ্যে, ওমরার জন্যে কোন সময় নির্ধারিত নেই। বছরের যে কোন সময় তা আদায় করা যায়। কিন্তু হজ্বের মাস এবং এর অনুষ্ঠানাদি আদায়ের জন্যে সুনির্দিষ্ট তারিখ নির্ধারিত রয়েছে। কাজেই এ আয়াতের শুরুতেই বলে দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের ব্যাপারটি ওমরার মত নয়। এর জন্যে কয়েকটি মাস রয়েছে, সেগুলি প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। জাহেলিয়াতের যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এ মাসগুলোই হজ্বের মাসরূপে গণ্য হয়ে আসছে। আর তা হচ্ছে শাওয়াল, যিলকদ ও যিলহজ্বের দশ দিন। আবু উমামাহ্ ও ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে তা'ই বর্ণিত হয়েছে।– (মাযহারী)

হজ্বের মাস শাওয়াল হতে আরম্ভ হওয়ার অর্থ হচ্ছে, এর পূর্বে হজ্বের এহ্রাম বাঁধা জায়েয নয়। কোন কোন ইমামের মতে শাওয়ালের পূর্বে হজ্বের এহ্রাম করলে হজ্ব আদায়ই হবে না। ইমাম আবু হানীফার মতে হজ্ব অবশ্য আদায় হবে, কিন্তু মাকরূহ হবে।– (মাযহারী)

فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِى الْحَجِّ

– এ আয়াতে হজ্বের এহ্রামকারীদের জন্য নিষিদ্ধ কাজ-কর্মের কিছুটা বর্ণনা দেয়া হয়েছে। এহ্রাম অবস্থায় যেসব বিষয় থেকে বিরত থাকা একান্ত কর্তব্য ও ওয়াজিব তা হচ্ছে 'রাফাস' 'ফুসুক' ও 'জিদাল'। رَفَثَ 'রাফাস' একটি ব্যাপক শব্দ, যাতে স্ত্রী-সহবাস ও তার আনুষঙ্গিক কর্ম, স্ত্রীর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা, এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস সংক্রান্ত আলাপ-আলোচনাও এর অন্তর্ভুক্ত। এহ্রাম অবস্থায় এ সবই হারাম। অবশ্য আকার-ইঙ্গিত দূষণীয় নয়।

فُسُوْقَ 'ফুসুক' –এর শাব্দিক অর্থ বের হওয়া। কোরআনের ভাষায় নির্দেশ লংঘন বা নাফরমানী করাকে 'ফুসুক' বলা হয়। সাধারণ অর্থে যাবতীয় পাপকেই 'ফুসুক' বলে। তাই অনেকে এস্থলে সাধারণ অর্থই নিয়েছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) 'ফুসুক' শব্দের অর্থ করেছেন — সে সকল কাজ-কর্ম যা এহ্রাম অবস্থায় নিষিদ্ধ। স্থান অনুসারে এই ব্যাখ্যাই যুক্তিযুক্ত। কারণ, সাধারণ পাপ এহ্রামের অবস্থাতেই শুধু নয়; বরং সব সময়ই নিষিদ্ধ।

যে সমস্ত বিষয় প্রকৃতপক্ষে না-জায়েয ও নিষিদ্ধ নয়, কিন্তু এহ্রামের জন্য নিষেধ ও না-জায়েয -তা হচ্ছে ছয়টিঃ

(১) স্ত্রী-সহবাস ও এর আনুষঙ্গিক যাবতীয় আচরণ; এমনকি খোলাখুলিভাবে সহবাস-সংক্রান্ত আলাপ -আলোচনা। (২) স্থলভাগের জীবজন্তু শিকার করা বা শিকারীকে বলে দেয়া। (৩) নখ বা চুল কাটা। (৪) সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার। এ চারটি বিষয় স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্যেই এহ্রাম অবস্থায় হারাম বা নিষিদ্ধ।

অবশিষ্ট দু'টি বিষয় পুরুষের সাথে সম্পৃক্ত। (৫) সেলাই করা কাপড় পরিধান করা। (৬) মাথা ও মুখমণ্ডল আবৃত করা। অবশ্য মুখমণ্ডল আবৃত করা স্ত্রীলোকদের জন্যেও না-জায়েয।

আলোচ্য ছ'টি বিষয়ের মধ্যে স্ত্রী-সহবাস যদিও 'ফুসুক' শব্দের অন্তর্ভুক্ত, তথাপি একে 'রাফাস' শব্দের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে এজন্যে ব্যক্ত করা হয়েছে যে, এহ্‌রাম অবস্থায় এ কাজ হতে বিরত থাকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, এর কোন ক্ষতিপূরণ বা বদলা দেয়ার ব্যবস্থা নেই। কোন কোন অবস্থায় এটা এত মারাত্মক যে, এতে হজ্বই বাতিল হয়ে যায়। অবশ্য অন্যান্য কাজগুলোর কাফ্‌ফারা বা ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। আরাফাতে অবস্থান শেষ হওয়ার পূর্বে স্ত্রী-সহবাস করলে হজ্ব ফাসেদ হয়ে যাবে। গাভী বা উট দ্বারা এর কাফ্‌ফারা দিয়েও পর বছর পুনরায় হজ্ব করতেই হবে। এজনেই فَلَارَفَثَ শব্দ ব্যবহার করে একে স্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

جِدَالَ শব্দের অর্থ একে অপরকে পরাস্ত করার চেষ্টা করা। এজন্যেই বড় রকমের বিবাদকে جِدَالَ বলা হয়। এ শব্দটিও অতি ব্যাপক। কোন কোন মুফাসসের এ শব্দের ব্যাপক অর্থই গ্রহণ করেছেন। আবার অনেকে হজ্ব ও এহ্‌রামের সম্পর্ক হেতু এখানে 'জিদাল'-এর অর্থ করেছেন যে, জাহেলিয়াতের যুগে আরবরা অবস্থানের স্থান নিয়ে মতানৈক্য করতো; কেউ কেউ আরাফাতে অবস্থান করাকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো, আবার কেউ কেউ মুযদালে ফাতে অবস্থানকে অত্যাবশ্যকীয় মনে করতো। তারা আরাফাতে যাওয়ার প্রয়োজন মনে করতো না। পথিমধ্যে অবস্থিত একটি স্থানকেই ইবরাহীম (আঃ)-এর নির্ধারিত অবস্থানস্থল বলে মনে করতো। এমনিভাবে হজ্বের সময় সম্পর্কেও তারা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করতো। কেউ কেউ যিলহজ্ব মাসে হজ্ব করতো, আবার কেউ কেউ যিলকদ মাসে। এসব ব্যাপারে তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে থাকতো এবং এ জন্যে একে অপরকে পথভ্রষ্ট বলে অভিহিত করতো। তাই কোরআনে করীম وَلَاجِدَالَ বলে এসব বিবাদের মূলোৎপাটন করেছে।

আর আরাফাতে অবস্থানকে ফরয এবং মুযদালিফাতে অবস্থানকে ওয়াজিব করা হয়েছে। এটাই হক ও সঠিক। উপরন্তু যিলহজ্ব মাসের নির্ধারিত দিনগুলোতেই হজ্ব আদায় করতে হবে, এ ঘোষণা করে এর বিরুদ্ধে ঝগড়া করাকে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। আবার কেউ কেউ এ স্থলে 'ফুসুক ও জিদাল' শব্দদ্বয়কে সাধারণ অর্থে ব্যবহার করে এ অর্থ নিয়েছেন যে, 'ফুসুক' ও 'জিদাল' সর্বক্ষেত্রেই পাপ ও নিষিদ্ধ, কিন্তু এহ্‌রামের অবস্থায় এর পাপ গুরুতর। পবিত্র দিনসমূহে এবং পবিত্র স্থানে, যেখানে কেবল আল্লাহ্‌র এবাদতের জন্যে আগমন করা হয়েছে এবং 'লাব্বাইকা লাব্বাইকা' বলা হচ্ছে, এহ্‌রামের পোশাক তাদেরকে সব সময় একথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, তোমরা এখন এবাদতে ব্যস্ত, এমতাবস্থায় ঝগড়া-বিবাদ ইত্যাদি অত্যন্ত অন্যায় ও চরমতম নাফরমানীর কাজ।

কোরআনের ভাষালঙ্কার ঃ فَلَارَفَثَ وَلَافُسُوقَ وَلَاجِدَالَ আয়াতের শব্দগুলো নেতিবাচক। হজ্বের মধ্যে এসব বিষয় নেই, অথচ উদ্দেশ্য হচ্ছে এ সকল বিষয়ের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা; যার জন্যে لا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا শব্দ ব্যবহার করার কথা ছিল। কিন্তু এখানে নেতিবাচক শব্দ ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, হজ্বের মধ্যে এসব বিষয়ের কোন অবকাশ নাই। এমনকি এ সবের কল্পনাও হতে পারে না। وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ —এহ্‌রামকালে নিষিদ্ধ বিষয়াদি বর্ণনা করার পর উল্লেখিত বাক্যে হেদায়েত করা হচ্ছে যে, হজ্বের পবিত্র সময়ে ও পুতঃ স্থানগুলোতে শুধু নিষিদ্ধ কাজ থেকে বিরত থাকাই যথেষ্ট নয়; বরং সুবর্ণ সুযোগ মনে করে আল্লাহ্‌র যিকির ও এবাদত এবং সৎকাজে সদা আত্মনিয়োগ কর। তুমি যে কাজই কর না কেন, তা আল্লাহ্ তাআলা জানেন; আর এতে তোমাদেরকে অতি উত্তম বখশিশও দেয়া হবে।

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى – এ আয়াতে ঐ সমস্ত ব্যক্তির সংশোধনী পেশ করা হয়েছে যারা হজ্ব ও ওমরা করার জন্য নিঃস্ব অবস্থায় বেরিয়ে পড়ে। অথচ দাবী করে যে, আমরা আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করছি। পক্ষান্তরে পথে ভিক্ষাবৃত্তিতে লিপ্ত হয়। নিজেও কষ্ট করে এবং অন্যকেও পেরেশান করে। তাদেরই উদ্দেশে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, হজ্বের উদ্দেশে সফর করার আগে প্রয়োজনীয় পাথেয় সাথে নেয়া বাঞ্ছনীয়, এটা তাওয়াক্কুলের অন্তরায় নয়। বরং আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করার প্রকৃত অর্থই হচ্ছে আল্লাহ্ প্রদত্ত আসবাবপত্র নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী সংগ্রহ ও জমা করে নিয়ে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করা। হুযুর (সাঃ) থেকে তাওয়াক্কুলের এই ব্যাখ্যাই বর্ণিত হয়েছে। নিঃস্বতার নাম তাওয়াক্কুল বলা মূর্খতারই নামান্তর।